

Reg. No. C. 334

সংখ্যা

ভাষা

হিন্দু-পত্রিকা

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম-সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা)



সম্পাদক

বনাস্বচাম্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,

সহকারি-সম্পাদক

যুতিসংখ্যামাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী ।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

ইং—১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯২১

বাং—২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

সংখ্যা: ১৮৩৯

অত্রিসংখ্যাবিক্রয়—প্রতি কাকমাটল ২, মাসে এই সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ পাই।

সূচী ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
১। প্রবোধচন্দ্রাদয়নাটকম্ ।	১১৩	৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।	২১৪
২। মায়া ।	২০২	৮। স্তম্ভিকথা ।	২১৮
৩। এত কঠাদায় কেন ।	২০২	৯। যুদ্ধযজ্ঞ ।	২২৪
৪। বন্দনা ।	২০২	১০। সংবাদ ও মন্তব্য ।	২৩১
৫। ইতরতা ।	২১০	১১। Co-operation and	
৬। পল্লীভবন ।	২১৩	Non-Co-operation.	

বর্তমানসংখ্যার লেখকগণের নাম ।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, ভ্রম্মচারী আনন্দ চৈতন্য, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীমতিলাল দাস, শ্রীহর্নাচরণ বাসুগুপ্ত, আত্মনাথ বিদ্যাভূষণ কাবতীর্থ, শ্রীমতীশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক, মহাকারী সম্পাদক, ইত্যাদি ।

শ্যামলালের প্রবন্ধাবলী ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, বহুবিধ—মাসিকপত্রের লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সামান্য মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রত্রিভি হাঙ্গিক, সামাজিক, আধ্যাতিক প্রবন্ধ, গল্প ও জবনী লেখনী পারিশ্রমিক হিলে ইংরাজী সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ ও অনুবাদ করিয়া দিয়া থাকেনা ৬৬নং কলেজস্ট্রীটে স্থায়িক গল্প ভাবে অথবা পত্র ভাৱা সন্নিবেশ জানিবেন।

শ্রীঃ ।

(১৮৪৫ সালের ২০ জুলাই মতে রেজিস্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা ।

২৮ বর্ষ, ২৮শ খণ্ড
৫ম সংখ্যা ।

ভাদ্র ।

১৩২৮ সাল ।
১৮৪৩ শকাব্দা

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্ ।

প্রথমায়ঃ ।

মধ্যাহ্নকর্মস্বীচিকাস্বিবপয়ঃপুরো বদভ্রানহঃ ।
খং বায়ুর্জলনোজলং ক্ষিত্তিরিতি ত্রৈলোক্যমুন্মীলতি ॥
যথস্বং বিদুমাং নিগীলতি পুনঃ স্রগ্ভোগিভোগোদমং ।
সান্দ্রানন্দমুপাস্মহে তদমলং স্বাত্মাববোধং মহঃ ॥ ১ ॥

অপিচ,-

অস্তুরাভৌনিয়মিতমক্লজিভবক্লরুঃ ।
স্বাস্ত্রে শান্তিপ্রণয়িনি সমুন্মীলদানন্দসান্দ্রম্ ॥
প্রত্যগ্ভ্যোতির্জয়তি যমিনঃ স্পষ্টললাটেনত্র-
ব্যাঙ্গব্যক্তীকৃতমিবজগদ্ব্যাপিচন্দ্রাঙ্কিমৌসেঃ ॥

বাহার অভাবে হায়
পঞ্চাঙ্গকবিশোধয়

মরীচিকায় অলভ্রমপ্রায় ।

পুনঃ যার জ্ঞান হ'লে

এই বিশ্ব যায় ঢলে

ক্ষুটালোকে বাণ্যসর্পণায় ॥

সেই আত্মজ্ঞানজ্যোতিঃ

ভাবের নির্গম অতি

উপাসনা করি উল্লি ভরে ।

প্রগাঢ় আনন্দময়

যাহার স্বরূপ হয়

যোগিগণ যাহা ধ্যান করে ॥

যোগিশ্রেষ্ঠশঙ্করের ভালনেত্রহলে ।

বিশ্বব্যাপিব্রহ্মজ্যোতি-লোকে যাহে বলে ॥

তুম্বার মধ্যে বায়ু নিরগমন কলে ।

ব্রহ্মরক্ষু ভেদি যাহা হয় । যোগবলে ॥

স্বরসাম্পদ চিত্তে বইয়া উদয় ।

করে যাহা যোগিচিত্তে সাজানন্দময় ॥

সে ব্রহ্মজ্যোতিয় হোক নিরন্তর জয় ।

যার ধ্যানে ঐতত্ত্বম শীঘ্র হয় লয় ॥

নান্দ্যশ্চৈ সূত্রধারঃ । অলমতিবিস্তরেণ । আদিকৌহল্যি সকলসামন্ত
 চূড়ামণিমরীচিমঞ্জুরীনীরাভিতচরণকমলেন বলবদরিবহব্রহ্মকটিকবাটপাটিন
 প্রকটিতনরসিংহরূপেণ প্রবলভরনরপতিকুলপ্রলয়মহার্ণবমগ্নমেদিনীসমুদ্ররণ
 মহাবরাহেণ নিখিলদিঘিলাসিনীকর্ণপূরীককীর্তিপল্লবেন, সমস্তাশাস্ত্রেশ্বরম
 কর্ণভাসাফালনবহুলতরপবনসম্পা চনর্জিতপ্রতাপানলেন, শ্রীমতা গোপালেন
 যথা খল্বশ্চসহজসুহৃদোরাশ্রঃ কীর্তিবর্ষ্মদেবশু দিগ্বিজয়ব্যাপারাস্তুরিণ
 পরমব্রহ্মানন্দৈরস্মাভিঃ সমুন্মীলিতবিবিধবিবয়রসদৃষিতা ইবাতিবাহিতাদিবা
 ইদানীস্থকৃতকৃত্যাবয়ং বতঃ,—

নীতাঃকয়ং ক্ষিত্তিভূজো নৃপতের্কিপক্ষা

রক্ষাবতী ক্ষিত্তিরভূঃ প্রথিতৈরমাতৈঃ

নাত্রাজ্যমস্তবিহিতং ক্ষিত্তিপালমৌলি—

মালার্কিতং ভূবি পয়োনিধিমৈখলায়াম্ ॥

(নান্দীঅস্ত্রে সূত্রধার) যাক্ আর বেশী বাড়াবাড়িতে কাজ নাই
যাঁর চরণকমল সমস্তসামস্তনৃপতিগণের মুকুটমণির আভায় বিরাজিত হচ্ছে,
যিনি এখন অরিসকলের বক্ষঃস্থল বিদারণ কর্তে নৃসিংরূপ ধারণ করেছেন,
এবং যিনি প্রবলতরবিগন্ধরাজকুলরূপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন মেদিনী উদ্ধার
কর্তে বরাহরূপ ধারণ করেছেন, যাহার কীর্তিপল্লব নিখিলদিক্‌বিলাসিনী-
গণ কর্ণালকার করেছে, সমস্ত দিগ্‌গঙ্গগণের কর্ণতালাস্কালনজনিতপ্রাণতর
পবনভরে যাঁর প্রেতাপানল নৃত্য কচ্ছে, সেই গোপালদেব আমাকে আদেশ
করেছেন যে, মহাজসুহৃদ রাজা কীর্তিবর্ষদেবের দিগ্বিঃরম্যাপারে এতদিন
আমরা ত্রক্ষানন্দরূপে বঞ্চিত হিলাম! হায়! হায়! বিবিধবিষয়রূপে এই
দিবসগুলি একান্তই দূষিতরূপে অতিবাহিত হইয়াছে এখন আমরা কৃতকৃত্য
হইয়াছি—

হ'য়েছে বিপক্ষ নৃপত্রের পরাভয় ।

রক্ষিতেছে ভূমণ্ডলসমুদ্রনিচয় ॥

স'ত্রাজ্য—নৃপতি মৌলিনালায় অর্চিত ।

পয়োধিনেথলা ভূমণ্ডলহ'য়েছে স্থাপিত ॥

তদ্বয়ং শাস্তিরনপ্রয়োগাভিনয়েনাত্মানং - বিনোদয়িতুচ্ছাসং । তদ্বদপূর্বি
মত্রভবন্তি: শ্রীকৃষ্ণমিশ্রে: প্রবোধচন্দ্রোদয়নামনাটকমতিনির্ম্মাণ ভবতে সমর্পিত-
নাসীৎ তদন্ত শ্রীকীর্তিবর্ষণঃ পূবস্তাদতিনেতব্যং ভবতা । অস্তিচাস্ত্রুপতেঃ
সপরিষদস্তদালোকনপুত্ৰুলমিতি, তদন্ততুগৃহং গতা গৃহিণীমাতুয় সঙ্গীতমবতারয়ামি
(পরিক্রম্য নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্যো । ইত্যন্ববৎ ।

অতএব এখন আমরা কোঁও এতটী শাস্তিরনপ্রয়োগ অভিনয়ধারা
আহুবিনোদন কর্তে ইচ্ছা করি। মাননীয় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক
একখানা অপূর্বনাটক নির্মাণ করে আপনার হাতে দিয়েছেন তাই অগ্রে
মহারাজ কীর্তিবর্ষার সম্মুখে অভিনয় কর্তে হবে। সপরিষদ মহারাজের
ঐ নাটক অভিনয় দর্শন কর্তে বিশেষবৌতুল আছে। সুতরাং এখন
ঘরে যাই গৃহিণীকে ডেকে এনে সঙ্গীতের অবতারণা করি (নেপথ্যাভিমুখে
করিয়া) আর্যো ! এদিকে এস,

প্রবিশন্তনতী । অঙ্ক । ইয়ন্নি আবেহু অঙ্কো কো নিও ও অশুচিটৌ

* আর্যো ! ইয়মশ্মি অঙ্কোপহু আর্যো: কোনিরোগোহুচীয়িতামীতি সৎ ।

নটীর প্রবেশ—

নটী । আৰ্ঘ্য । এই যে আমি, কি নিয়োগ অনুষ্ঠান কর্তে হবে আদেশ
করণ ।

সূত্র । আৰ্ঘ্যো ! বিদিতমেব ভবত্যা ।

ভাস্ত্রপ্রভাথিপৃথ্বীপতিবিপুলবলারণ্যমুর্চ্ছংপ্রতাপ-
জ্যোতির্জালাবলীচত্রিভূবনবিবরো বিশ্ববিভ্রাস্তকীর্তিঃ ।
গোপালো ভূমিপালান্‌প্রসভমসিলভামা ত্রিমিত্রেণ জিহ্বা
সাত্ৰাজ্যেকীর্তিবর্ষা নরপতিভিলকো যেনভূয়োহভ্যবেচি

অপিচ ।

অস্তাপুশ্মদযাতুধানতরুণীচকলকরাফালন—
ন্যাবল্গম্‌কপালভালরণিতৈ নৃত্যংপিলাচাস্রনাঃ
উদগায়ন্তি যশাংসি যস্ত বিস্তৃতৈর্নাদৈঃ প্রচণ্ডানিল-
প্রক্ষুভ্যৎকরিকুস্তকৃটকুহরব্যাতৈকুরণক্ষৌণয়ঃ ॥

সূত্র । আৰ্ঘ্যো ! তোমার ত জানাই আছে যে ;—

নিপক্ষনৃপতিসৈশ্চ অরণোমুর্চ্ছিত
স্বকীর প্রতাপানলে—ঘোরজ্বালাময় ।
ত্রিভুবনবিবরযিনি মহাকীর্তিনালী
করেছেন পূর্ণ হায় ! নিজবাছবলে
একমাত্র অসিলতা করিয়া সহায়
দস্তে দলি ভূমিপালগণ অনায়াসে
অভিবিষ্ট করেছেন কীর্তিবর্ষনৃপে
নরপতি কুলের ভিলক ভূমণ্ডলে ।
উন্নত হইয়া যথা পিলাচ অস্রনা
করিতেছে নৃত্য হায় দিবসরজনী
উন্নতরান্‌সীকর ভাড়নে চকল
নৃকপাল ভালসহ সেই রণভূমি
গাহিতেছে যশোরশি যার অস্তাবধি
করিকুস্তকুহরেতে প্রবিষ্ট প্রচণ্ড
পবন সম্পাহধনি ছলে অবিরত ।

সার্বক পোপাল নামা রাজ সেনাপতি
বিপ্রকুলচূড়ামণি ধাঙ্গিক সুধীর।

তেনচ শাস্ত্রবস প্রতিহেনাকনো বিনোদার্থে প্রবোধ—
চন্দ্রোদয়ং নামনাটকমভিনেহুমাতিমৌহিনী
তদাদিশ্চস্তাঃ ভবত্বা নিকপরিগ্রহায়।

তিনি এখন শাস্ত্রবসের পথিক হয়ে আত্মবিনোদন জন্য প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয় কর্তে আদেশ করেছেন, তুমি যাও অভিনেতৃগণকে বেশ পরিধান কর্তে আদেশ কর।

নটী (সবিস্ময়ং) অচ্চরীঅঃ! তচ্চরীঅঃ!

যেন নিম্নভূতবলনির্ভঙ্কিতসকলরাজমণ্ডলেন আশ্রয়াদিত্য কটিন কো অণু বহলবরিসমুদ সনিঅর জ জরিত তুরজ তুরঙ্গমাণঃ নিরন্তর নিবড়স্ততিক্খ বিক্খিও মহত্ সস্তপজোগিত্তুস মাত্ত মহামহীঅর সহস্রঃ ভস্মস্ত ভু অদণ্ড চণ্ড মন্দরাতিঘাত ঘুমন্ত সঅল পত্তি সলিঅ সংঘাদং বঙ্গসেগসাতরং নির্মহিঅ মহমহনেন বিঅ চ্ছীরসমুদ্রঃ সমাগাদিত্য সমরনিকঅ লচ্ছীঃ তস্মসাম্পদঃ সঅলমুনিঅন সলাহনীঅচরিতস্ম কথংহাদিসো উবসমো সংবুস্তা। ●

নটী। কি আশ্চর্য্য? কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ মধুসূদন যেমন সমুদ্রমস্থন করে লক্ষ্মীলাভ করেছিলেন, সেইরূপ যিনি কর্ণরাজের সৈন্যসমুদ্রমস্থন করে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেছেন, যদি বল কর্ণ সৈন্যের সহিত যে সমুদ্রের উপমা দিলে এটুকি ঠিক হ'ল? সমুদ্রে যে তরঙ্গ থাকে, মধ্যে মধ্যে পাহাড়পর্বত থাকে তোমার এ সমুদ্রে তরঙ্গ কৈ? পর্বত কৈ? আছে বৈ কি। অশ্বগুলিই আমার এ সমুদ্রের তরঙ্গ, উন্নতকার হস্তীগুলিই পর্বত।

● আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যঃ। যেন নিম্নভূতবলনির্ভঙ্কিতসকলরাজমণ্ডলেন আকর্ণাকৃষ্টকটিনকোদণ্ডবহলবৃষ্টিমাণসমুতশরনিকরজর্জরিততুরগতরঙ্গমাণঃ নির-
ন্তরনিপতস্তীক্খবিক্খিণ্ডসহস্রপর্ধ্যাসিতোহুসমাত্তমহামহীঅরসহস্রঃ ভ্রমহুঅদণ্ড-
চণ্ডমন্দরাতিঘাতঘূর্ণমানসকলপত্তিমসিলসংদাঃ কর্ণ সৈন্য সাগরঃ নির্মহা
মধুমথনেন ক্ষীরসমুদ্রগিব স্যাসাদিত্য সমর বিজয় লক্ষ্মীঃ তন্ত সাস্প্রতঃ
সকলমুনিঅনস্লাহনীঅচরিতস্ম কথমীদৃশ উপণমঃ সংবুস্তঃ। ইতি সং)

তাই বল্ছিলাম যে যিনি নিজভুজবলে সমস্ত নৃপতিগণকে নির্ভংসিত করেছেন, এবং আকর্ণাকৃষ্টে কঠিন কোদণ হ'তে অবিরত শরনিকর বর্ষণ ক'রে যিনি ঐ তুরদত্তরঙ্গসকল অর্জুরিত করেছেন, স্বহস্তবিক্রিণ্ডা তীক্ষ্ণ শস্ত্রাঘা উন্নতকায়হস্তীসমূহরূপে মদীধরগণকে বিক্রান্ত করেছেন, এবং অবিরতপ্রাম্যমান মন্দারপর্বতাদৃশ নিম্ববাহুযুগসদ্বারা যিনি কণ্ঠসৈন্য সাগর মস্থন করে বিক্রয়লক্ষ্মী লাভ করেছেন, তাঁর আঞ্জ সকল মুনিজনের শ্লাঘনীয় একরূপ উপশম কি করে হ'ল ?

সূত্র। আর্ঘ্যে। নিসর্গসৌম্যমেব ব্রাহ্মণঃ স্রোতিঃ কুতোহপি কারণ—
 কশাৎ প্রাপ্তবিকারমপি পুনঃ স্বভাববহবতিষ্ঠতে যতঃ সকলভূপালকুল
 প্রলয়কালাগ্নিক্রমেণ চেদিপতিনা সমুন্মূলিতঃ চন্দ্রাশ্বয়পার্শ্বানাং পৃথিব্যা
 মাধিপত্যং স্থিরীকর্তুমরমশ্চ সংরতঃ। যশ্চ ;—তথা কল্পান্তসংকোভলজিহা
 শেবভূভূতঃ সৈর্ষ্যং প্রসাদো মর্ফাদা স্তা এবহি মহাদাধঃ ॥

সূত্র। আর্ঘ্যে। ব্রহ্মভেজ স্বভাবতই সৌম্য কোনও বিলোমকারণে
 কদাচিত্ বিকারপ্রাপ্ত হ'লেও পুনরায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সকল ভূপালকুল
 কুলের প্রলয়কালাগ্নিক্রমে চেদিপতি পৃথিবী হ'তে চন্দ্রাশ্বয়ীসরাজগণের আধিপত্যের
 সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করেছিল, তাই পৃথিবীতে চন্দ্রাশ্বয়ী নৃপতিগণের আধি-
 পত্য স্থির করিবার অশ্রুই ইহার এই কোদণের উদয়। দেখ ;—

কল্পান্ত সংকট সেন সৌম্যসিগর।
 মুহূর্তে সজ্বন কার উন্নতভূধর ॥
 স্থিরতা প্রসাদে কিম্বা মর্ফাদা ভাংহর।
 মুহূর্তপরেতে সেন ঠিক সুর্যকার ॥

অপিচ। ভগবন্তারাকর্শনসমূহা ভূতবিতান ত আধিপৌরবহুষণাঃ
 ক্রিতিতলমবতীর্ষ্যানিপ্পাদিতকৃত্যঃ পুনঃ পাপ্তিনেন প্রপদ্যন্তে। তথাহি
 পরশুরামেন ভাবদাকারতু ভবতী।

যেন ত্রিঃসপ্তকোহনৃপবহনসর্গসংলমস্তিকপকপ্রাবান্নেহকারি ভূরিচাত-
 কধিরসরিধারিপূরেহভিষেকঃ, যশ্চ জীবালবৃদ্ধাবধি নিধনবিধৌ নির্দয়োবি-
 ঞ্চকঃ সৌরাজন্যোচ্চাংশকৃটক্রথনপট্টরটেশ্বোরগারঃকুর্ভারঃ। নোহপি স্ববীর্ষ্যাদ-
 বত্যাভ্যভারং ভূমেঃ সমুৎথায় কুলং নৃপানান্ প্রপান্তকোপজ্বলনস্তপোতিঃ স্রীমান্
 মুনিঃ শাম্যতি জামদগ্নিঃ।

ভগবান্ নারায়ণের অংশ সম্ভূত মহাপুরুষগণ ভূতভিতের জন্ম প্রবল পুরুষকারে ভূষিত হ'য়ে ভূতলে অবতীর্ণ হন, এবং কার্যক্ষেমে পুনরায় শাস্ত্যাব অবলম্বন করেন, একবার পরশুরামের দিকেই তাকাইয়া দেখনা যিনি ;—

নৃপতির বদনানংন সস্তিকপঙ্কিল ।
 কত্রিয়শোণিতনদী কি মহাম'বিল ॥
 একবিংশবার যিনি তাহাতে তর্পণ ।
 করিয়া হ'তেন হায় আনন্দে মগন ॥
 স্ত্রীবালবৃদ্ধাবধি করিতে নিধন ।
 নির্দয় কুঠার যিনি করেন ধারণ ॥
 ঘোরধার সে কুঠার ক্ষত্রিয়হেতন ।
 করিতে উত্তত হয়েছিল অলুক্ষণ ॥
 ভূভার হরিয়া তিনি নিজবাহুবলে ।
 নাশিয়া ক্ষত্রিয়কুল উরুত সমূলে ॥
 পুনরায় শাস্ত্যাব করিয়া ধারণ ।
 করিলেম তপঃ জ্যোতিঃ অচের ভূষণ ॥

উষায়মপি কৃতকৃত্যঃ সম্প্রতিপরমামুপশমনিষ্ঠাঃ প্রাপ্তঃ, যেনচ, —
 বিবেকেনেবনির্জিত্যকর্ণমোহমিনোজ্জিতং । ক্রীকীর্তিবর্ষনৃপতেকোথাভ্যাদয়ঃ কৃতঃ ।।
 (নেপথ্যে) আঃ পাপ ! শৈলু'ষাধম ! কথমস্মাহু জীবৎসু স্বামিনো মহানোহহু
 বিবেকসকাশাৎ পরাজয়মুনাহরসি ।

সেইরূপ এই গোপালদেব ও কৃতকৃত্য হইয়া সম্পূর্ণ উপশমনিষ্ঠা প্রাপ্ত হ'য়েছেন । বিবেক যেরূপ মহানোহকে পরাজয় কো'রে প্রবোধ চন্দ্রের উদয় করিয়েছিলেন সেইরূপ গোপাল দেবুও কর্ণনৃপতিকে পরাজয় ক'রে কীর্তিবর্ষ নৃপতির উদয় করিয়েছেন (নেপথ্যে) যে পাপাত্মা নটাধম ! আমরা জীবিত থাকতে আমাদের প্রভু মহা যোহির বিবেক হই নিকট পরাজয় ঘোষণা করিহু ।

মূত্র । (সভয়ং রিলোকা) অয়ে ।

উত্তরপীবরকুচয়পীড়িতান —
 মালিন্ধিতপুলকিতেন ভূজেন রত্যা-
 ক্রীমান্ অগস্তি মদয়ন্নরনাতিরামঃ
 কামোহয়মেতি মদঘৃণিতনেত্রপদ্যঃ ।

নুনঃ মধুচনাচোপল্লাভক্ৰোধইবানৌ লক্ষ্যতে তদপসরণমেবস্মাকমিতঃ
শ্রেয়ঃ (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ প্রস্তাবনা)

সূর্য। সত্যেদৃষ্টি করিয়া) অরে ?

উন্নত পৌবর কুচযুগলে পৌড়িত

পুলকিত ভুজে রতি সহ আলিঙ্গিত

মদবিঘ্ন নিত মরি যুগলনয়ন ।

দৃষ্টি গাত্রে মাতাইয়া হায় হিভুধন ।

মরি ! মরি ! কি মুরতি ময়নাভিরাম ।

ললিত গমনে হায় । আসিচ্ছে কাম ॥

বোধহ'চ্ছে আমার কথায় লোকটা চোটে গ্যাছে, যা হোক আমার এখন
এখান থেকে সরে পড়াই মঙ্গল, সূর্যধর ও নটীর প্রস্থান ।

ইতি প্রস্তাবনা ।

(ততঃ প্রবিশতিযথানির্দিষ্টঃ কামোরতিশ্চ)

কামঃ । (মক্রোধঃ) আঃ ! পাপ ! (ইতিপঠিত্বা) নব্বরে ভরতাধম !

প্রভবতি মনসিবিবেকোবিদুযাগপিশাশ্রুসম্ভবস্তাদং ।

নিপতন্তিদৃষ্টিবিশিখায়াবমৈন্দীবরাক্ষীণাঃ ॥

অপিচ

রম্যাংহর্ষাতলঃ নবাঃ সুনয়না গুঞ্জদ্বিরফা লতাঃ ।

প্রোন্মীলন্নমালিকানুরভয়োবাতাঃ সচন্দ্রাঃ কৃপাঃ ॥

যচ্ছেতানি জয়ন্তি হস্ত । পরিতঃ শস্ত্রাণ্যমোঘানি মে ।

তন্তোঃ ! কৌদৃগসৌধিবিকবিতবঃ কৌদৃক্প্রবোধোদয়ঃ ॥

(কাম ও রতির প্রবেশ)

কাম । রে পাপাঙ্গা নটাদম ! আমরা জীবিত থাকতে আমাদের প্রভু
মহামোহের বিবেকের নিকট পরাজয়ঘোষণা করছি। রে, ভরতাধম ! তোদের
বিবেকের প্রভু কতক্ষণ জানিস্ শোন ;—

গীত ।

রাগিনী মূলতান, ভাল একতলা ।

বিবেক থাকে ততক্ষণ ।

পণ্ডিতেরি মনে, শাস্ত্র অধ্যয়নে

কিন্সা গুরু উপদেশ শুনে

বহু সুমতনে যাহা করেছ অর্জন ॥

হায় ! যতক্ষণ করিয়া যতন
 স্ফলনয়না অতি সুবদনা
 নাহি করে দৃষ্টিবিশিখবর্ষণ
 রম্য হর্ষ্যাতল, ষ্ট্রীসকল
 ভ্রমর গুণ্ডন, কোকিল কুঞ্জন
 নব গালিকায় সুরভি পবন ।
 চাঁদনী রজনী বাহারে নাথানি
 রতির স্বপ্ননী বিবেকনাশন ।
 থাকে যদি হায় এই সমুদয়
 অমোঘান্ত্রচয় বিবেকদলন ।
 তাহ'লেত বুকি বিনেকের বল
 কিরূপে দা হয় প্রবোধ উদয়
 কেবা করে মহামোহের দগন ॥

রতিঃ । অস্ত্রউত্ত ! গুরু শুধু মহারাজমহামোহস্য পড়িবা গো বিবেক
 স্তিত্বকেমি । ●

রতি । আর্ষ্যপুত্র ! মহারাজ মহামোহের প্রতিপক্ষ বিবেককে আমি
 অতিশয় গুরুতর নলে মনে করি ।

কামঃ । প্রিয়ে ! কুতস্তবেদং ক্রীষভাবহুলভং বিবেকান্ত্রমুৎপন্নং ।
 পশ্য ;—

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্বিংশতিবিম্বাভূষণ ।

● আর্ষ্যপুত্র ! গুরুঃখলু মহারাজমহামোহস্ত প্রতিপক্ষো বিবেক ইত
 ত্বর্কয়ামি । ইতি সং ।

মায়ী ।

সৃষ্টির প্রথমবাগ্নে পুরাণ পুরুষ
নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্মসনাতন ।
আশ্রিত মায়ায়
আধারপি ত্রিগুণ,
আজ্ঞা দিল নিস্বাইতে এতিন ভূবন ।
আপনি পুরুষের রহিল একান্তে
নিশ্চল নিশ্চেষ্ট
মাফী মাত্র হয়ে ।
কার্যকরী শক্তি গতি
মায়া মোহময়ী
সম্ভাবর জগম আদি করিল নিস্বাণ
মন্ত্র রজঃ তমঃ গুণে আধির পলকে ।
পারে সে ত্রিলোকমায়া, করমকুশলা,
আচ্ছাদিত করি সবে নিজ আবরণে
সৃষ্টির প্রধান অংশ করিল গ্রহণ ॥

শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য কব্যবিনোদ

এত কন্যাদায় কেন ?

সমাজে এত কন্যাদায় কেন ? শুধু বলালীকৌলিষ্ঠ ও পণপ্রথা কি
এই কন্যাদায়ের জন্ত দোষী ? তাহা ত নহে । একজন শ্রমজীবির ঘরে
অমুসন্ধান করুন দেখিবেন তাহার পঁচটী পুত্র থাকে ত 'একটীমাত্র কন্যা',
একজন চাষীর ঘরে অমুসন্ধান করুন দেখিবেন তাহার ঘরে পুত্রের সংখ্যাই
অধিক । কন্যার আধিক্য কেবল বিলাসিতাপ্রিয় ভঙ্গসমাজেই অধিক দৃষ্ট
ঘয় । ইহার কারণ এই যে তথাকথিত ভঙ্গমহোদয়ের বালকগণ ছাদণ

বর্ষা বয়স হইতেই নানারূপ অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক উপায়ে শরীরের সারভূত বীৰ্য্যের অপচয় করে, তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপীকৃত পুস্তক গলাধঃকরণ করিয়া চাপরাশ লইতে শারীরিক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম তাহাদিগকে অধিক করিতে হয়, আর দেশের ঘৃণ ছুড় অগ্নিমুখ্য নলিয়া তাহা স্পর্শ করিতে না পারায় যুবকগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়পতাকা হস্তে লইয়া বহির্গত হইয়া আসে এবং দুইতিনহাজার টাকায় বস্ত্র বিশেষের পিতার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া সংসারদর্শ্যে মন দেয়, তখন তাঁহার বীৰ্য্যো সন্তানোৎপাদনের শক্তি আদৌ না থাকায় অথবা স্বল্প থাকায় কেবল স্ত্রীর শক্তিবলে পালে পালে বস্ত্রাগণই প্রসূত হইতে থাকে। ইহার ফলে দিন দিন ভ্রমসমাজে রুতার সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। যদি বা দুই একটা পুত্র দৃষ্ট হয় তাহা এত রোগজীর্ণ ও শীর্ণ যে তাহার অস্তিত্ব-বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। যাহা হোক, কন্যাদায় প্রথা যদি সমাজ হইতে হিরোহিত করিতে হয়, তবে বাহাতে পূর্বের ন্যায় আমাদের ভবিষ্যৎবংশধরগণ বাল্যে ও কৈশোরে ব্রহ্মচর্যা শিক্ষা করিয়া ধর্মভাবে অমুপ্রাপিত হয় এং কোনরূপ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় শরীরের সারসত্ত্ব অপচয় করিয়া তাহারা সুন্দর, সুঠাম, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, বিনীতায় সন্তানোৎপাদন হইতে বঞ্চিত না হয় তদুজ্জনা তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু এ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা তা প্রচলিত স্কুল ও কলেজে হইবে না। যেখানকার পুস্তকে রোমিও জুলিয়েটের উলঙ্গমূর্তি অঙ্কিত করিয়া উদ্ভিন-যুবকগণের হৃদয়ে লালসার বহি প্রজ্জ্বলিত করা হয়—যেখানে সন্তোর ছন্দবেশে মিথ্যাকে সাজাইয়া কিত্রুপে অর্পোপার্জন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে আমরা ব্রহ্মচর্যা ও ধর্মশিক্ষার তালা বন্ধিতে পারি না। স্থার গুরুদাসকে যেমন তাঁর জননী স্বদর্শ্যে, ভ্যাগে, ব্রাহ্মণহেতু সত্যনিষ্ঠার দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং গুরুদাসের চরিত্র যেমন তাঁহার মায়ের সংশিকায় গঠিত হইয়াছিল তেমনিভাবে বঙ্গদেশের জনকজননী স্ব স্ব পুত্রগণকে অবসরসময়ে ব্রহ্মচর্যা, স্বজাতীয়তা, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ প্রভৃতি শিক্ষা দেন, তবে তাহাদের মনে ধর্মভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে বালকগণের মধ্য হইতে এই অস্বাভাবিক উপায়ে বীৰ্য্য অপচয়ের প্রণালী উঠিয়া গিয়া কালে সুন্দর, সুঠাম পুত্র সন্তানাদি প্রসূত হওয়ার দেশের মধ্য হইতে এই কন্যাদায়ের ক্রন্দন মন্দীভূত হইতে

পারে ? ইহাই হইল কণ্ঠাদায় স্রোতাস্বিগীর মূল এই মূল রোধ না করিয়া
শাখা প্রশাখা কর্তন করিলে বিষবৃক্ষের বৃদ্ধি বন্দ হইবে না।

আর কণ্ঠাকষ্ঠাগণকেও বলি, যদিও মনু বলিয়াছেন রজস্বলা কণ্ঠা ঘরে
রাখিলে পিতা সেই কণ্ঠার শোণিত পান করেন তথাপি তাঁহারা যেন বাস্তব
সমস্ত হইয়া পিতৃভাতৃদের কর্তব্য তুলিয়া একটা বৃদ্ধ অরাজীর্ণ, শীর্ণকার
ব্যক্তির হস্তে সোণার পুস্তকী সম্প্রদান করিয়া তাহাকে চির শোক-মাগরে
না জ্ঞান। “পিতা পিবতি শোণিতম্” একথাও যেমন মনু বলিয়াছেন,
তেমনি সেই নশুই আবার বলিয়াছেন—

“কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কণ্ঠকৃত্যপি
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছনু গুণহীনায় কর্হিচিং”

অর্থাৎ কণ্ঠা ক্ষতমতী হইলেও আমরণ তাহাকে অনিবাহিত রাখিবে সেও
ভাল তথাচ তাহাকে গুণহীন পাত্রে কখনও দিবে না।”

যে পিতামাতা কণ্ঠা জন্মদান করিয়া তাহাকে বৃদ্ধ অরাজীর্ণের হস্তে অর্পণ
করিয়া নিশ্চিন্ত হন, আমি সে পিতামাতাকে স্নেহময় ও স্নেহময়ী জনকজননী
বলিতে পারি না, তাঁহারা রাকস ও রাকসী—দানব ও দানবী পাষণ্ড
ও পায়ালী।

“কন্থাপ্যবং পালনীয় শিক্ষণীয়াত্তিত্ততঃ

দেয়া বরায় বিদূষে ধনরত্নসময়িতা

অর্থাৎ কন্থাকেও পালন করিতে হইবে এবং যত্নের সহিত শিক্ষা
দান করিতে হইবে, তদনন্তর তাহাকে ধনরত্ন সমন্বিতভাবে বিদ্যান বরে
দিতে হইবে।”

তিনিই পিতা যিনি এইভাবে কন্থাকে সম্প্রদান করিতে পারেন।
তিনিই পিতা যিনি পুত্রকেও যেভাবে লালনপালন করেন, কন্থাকেও
সেইভাবে পালন করেন তিনিই পিতা যিনি সৌভা, সাবিত্রী, দময়ন্তী,
শৈব্যার আদর্শে কন্থাকে শিক্ষা দান করিতে পারেন এবং তিনিই সত্য
পিতা যিনি যথাগাধ্য কিকিৎ ধনরত্ন দিয়া বিদ্যান, সুন্দরপাত্রে কণ্ঠারত্ন
অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু কথা হইতেছে কোন্ পিতামাতার হৃদয়ে
কন্থাকে গৎপাত্রে দিবার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত না হয় ? কোন্ পিতামাতা
ইচ্ছা না করেন যে আমার কণ্ঠাটী এমন পাত্রে সহিত বিবাহিত হোক
যাহাকে দেখিলে তাহার হৃদয় আনন্দে উবেলিত হয়। কিন্তু এই বিদ্যান

সুপাত্রেয় ছায়া স্পর্শ করিবার শক্তি কি কাহারও আছে? ইহারা এক পয়সা উপার্জন করিতে পারেন বা না পারেন পনের বেলায় ইহাদের উর্জ্জন গর্জন শুনিলে সিংহের গর্জন বলিয়া ভ্রম হয়। একজন "মাতৃকুল অশন" পাশের মূল্য অফিসে ১৫ পনের টাকার অধিক নহে, অর্থাৎ দেড়ঘণ চাউলের মূল্যও যাহা একজন "মাতৃ কুল-অশনের" মূল্যও তাহা, কিন্তু পনের বেলায় ইহাদের মূল্য পঁচাত্তর এক কপর্দিকও কম নহে। রামায়ণে পড়িয়াছিলাম শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণের স্ত্যস্ত্যভিতে সম্বুত হইয়া ধনুর্দাঁপ ছাড়িয়া আর রাবণকে হত্যা করিবেন না বলিয়া তুম্বীস্তাবে বসিয়া পড়িলেন, তখন দূর্টসরস্বতী রাবণের রসনায় উপবেশন করিয়া রামের প্রতি এমন সব কটুক্তি করিতে লাগিল যে রাম অবশেষে উত্তেজিত হইয়া রাবণকে নিধন করিলেন। তামাদেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে পুনরায় "সরস্বতীর" আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি এবার শতকরা একই জন বালককে "মাতৃ কুল-অশন" পাশ করাইয়াছেন। ইহার ফলে সরস্বতীর সাধের স্বর্ণলঙ্কা সমৃদ্ধ হইলেও এই "মাতৃ-কুল-অশন" পাশরূপী মৃত্যুবাণের দ্বারা বঙ্গের কতশত কুলবালা যে জলিয়া পুড়িয়া মরিবে তাহার ইয়ত্ব নাই। Aesop's fable এর একটা গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটী এই-একপুকুরে কতকগুলি বালক টিল ছুঁড়িতে ছিল, পুকুরে কতকগুলি ডেক ছিল। বালকদের নিকিপু টিলের আঘাতে কতকগুলি বেড়াটি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় একটা বৃদ্ধ বেড় উঠিয়া বলিল "ওহে বালকগণ! আগ আম, what is play to you, is deth to us অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে যাহা ক্রীড়া আমাদের পক্ষে তাহা যে মৃত্যু।" দেশে যাহারা নিরাশ্রয়া অভাগী কন্ডার অভিভাবক আছেন তাহারা যদি একযোগে একবার সিনেট সভায় বাইরা তথাকার সভ্যগণকে বলেন "ওহে সুধীগণ আর আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিয়া এ বাল্যক্রীড়া করিও না।" তাহাই হইলে বোধহয় কতকটা কন্ডাদায় কমিতে পারে। আছেন কি কেহ ভেমনধারা অকুতোভয়, যিনি এই কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন?

আর দেশের যুবকবৃন্দ তোমাদিগকেও একটা কথা বলি। বলি যে তোমরা মানুষ হও। নিজের উপার্জনে ঘন, ঘড়ি কুলাও, সাইকেল চড়-মাতৃবের মত বুক ফুলাইয়া চল, আমরা গরুর মত কন্ডার বাজারে বিক্রীত হইয়া বিলাসিতা করিব না। জীবনে একটু ধিকার আসেনা? তোমার দেশে মাড়োরারীগণ লোটা ও কন্দল সম্বল লইয়া আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যকারী

আজ কলিকাতা নগরীকে উর্নভের জালের ছায় প্রাসাদে প্রাসাদে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তার তুমি “শ্রুতি” অবলম্বন করিয়া ভিখারীর ছায় কোন মতে দিনযাপন করিয়া নিজের বিলাসিতার উপকরণ নিঃস্র কণার পিতা মাতার নিকট হইতে আদায় করিতেছ ? ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব। ভাগ না করিলে সুখ হয় না, যাহা ভূগা, যাহা নিতা, তাহার জন্ম ধাবিত হও, ভাগী হও, তোমার মনুষ্যত্ব জাপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে। তুমি কি মনে কর যে স্ত্রীর মাতাপিতাকে পথের ভিখারী করিয়া তুমি তাহার পাণিগ্রহণ করিলে, সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া তোমায় ভাল বাসিতে পারে ? তা কখনই পারে না। যখনই দিনান্তে পরিশ্রমের পর তোমার স্ত্রী তোমার মুখাবিন্দু দেখে তখনই তার মনে হয় যে, এই স্বামী হইতে আমার মাতা পিতা আজ পথের কাঙ্গাল, তখনই তাহার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি যতকিছু আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি গিরোহিত হয়, তারও একটা বিষয় আছে, অনেক যুবক আমাকে বলিয়াছেন “মহাশয়। যদি খুব সুন্দরী পাত্রী দিতে পারেন তবে আমি বিনাপণে বিবাহ করিতে পারি।” কি আশ্চর্য্য ? এখানেও স্বার্থপরতা। আপনারা কি মনে করেন স্ত্রী সুন্দরী হইলেই তাহার প্রতি দাম্পত্যপ্রেম প্রস্ফুটিত হয়, অগ্রহ হয়না ? অনিন্দসুন্দরী, উর্বরী বা রম্ভা মেনকা বা তিলোত্তমার ছায় রমণীকে স্ত্রীয়ে বরণ করিয়া তাহার প্রতি যে ভালবাসা তাহা পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম নহে, তাহা “মোহ”—রূপজ মোহ মাত্র। যতক্ষণরূপ ততক্ষণই এই রূপজমোহের নেশা থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপের লহর মন্দীভূত হইলে তখন সে স্ত্রীর প্রতি তার তেমন আকর্ষণ থাকে না ! নিঃস্রলক্ষিতিকব্জলাশয়ে যেনম কুণলয় প্রস্ফুটিত হয় না, সমল পঙ্কিলস্থির জলাশয়ই যেনম পঙ্কজের জন্মস্থান, তদ্রূপ মৌন্দর্যের চঞ্চল সরোবরে কখনও দাম্পত্য প্রেমের শতদল প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। প্রশান্ত শেতশুভ্র সুনির্মলগগনে পূর্ণ ইন্দুর পূর্ণবিকাশ অপেক্ষা শরতের নীলাম্বরে পৌর্ণমানী শশাঙ্কের অর্ধবৃত্তি অধিকতর মনোরম ! যে স্ত্রী স্বামীকে তাহার মৌন্দর্য্যমুগ্ধ বলিয়া জানে, সে কখনও তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পঞ্জলি প্রদান করিতে পারে না। বিভূতিমণ্ডিত, অহিকুণশোভিত, দীর্ঘজটাজুটধারী, গঞ্জিকাসেবী মহাদেবকে সতী ভাল বাসিতেন কোন গুণে ? সে গুণ আর কিছুই নহে ; মহাদেব বিশ্বসুন্দরী সতীর রূপের অনলে আত্মবিদর্শন করেন নাই বলিয়া। সতীদ রূপের অনলে পতঙ্গের ছায়

মহাদেয় তাঁহার যোগ, ওশঃ, আর্হিত দেন নাই বলিয়াই ত সতী মহাদেবকে
এত ভালবাসিতেন। শুধু এই কারণেই সতী দক্ষযজ্ঞ পতিনিন্দা শুনিয়া
দেহ ভাগ করিয়াছিলেন। তোমরা স্ত্রীকে ভোগের বস্তু বলিয়া মনে
কর, স্ত্রী তোমাদের নিকট একটা ভোগ পিপাসার বস্তু মাত্র, তাই তোমাদের
স্ত্রীও তোমাদিগকে ভালসা নিবৃত্তির একটা বস্তু এই জন্ত কিছুই মনে করে
না। এই জন্তই ত বলিতেছি যদি কেহ স্বার্থভাগপূর্বক দরিদ্রকন্য়ার
পানিগ্রহণ করিতে বন্ধপরিকর হইয়া থাক, তবে আর সুন্দরী অসুন্দরী
বলিয়া আপত্তি তুলিও না। শ্রীমতী রাধিকা কেলে সোণা কন্যাকেই ভালবাসিতেন,
যমুনার কালজলেই তিনি কেলি করিতে পছন্দ করিতেন। যাহা কাল
ভাহাই যে ভাল। তাই দেখ বিশ্বপালস্বিনী মা কালী আমার কালো। এই
কালোর সাধনাতেই কত মুগ্ধ সাধক মুক্তি পাইয়াছেন। কালো মেয়ে বিবাহ
কর, তাকে ভোগের বস্তু মনে না করিয়া তার জ্বরে আত্মশক্তি মহামায়ার
অংশ উপলব্ধি কর, আর তার গর্ভে যে সম্ভান হইবে তাহাকে জ্বরের গোপাল
বলিয়া মনে কর, দেখিবে তোমাদের এই সংসার মরু সুখের বৃন্দাবনে পরিণত
হইবে। বিবাহের উদ্দেশ্য কি? বিবাহ করিলে সম্ভান উৎপন্ন হইবে, সেই
সম্ভানের মুখ দেখিয়া হৃদয়ে অপভ্রাতের উৎপত্তি হইবে। নিজের পুত্রের
প্রতি বাৎসল্য উপলব্ধি করিয়া পরের পুত্রকেও বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত
করিল, ইহাই ত বিবাহের উদ্দেশ্য। নিজের মায়ের পাদপদ্ম দেখিয়া পরের
মাকে—বিশ্বের রমণীবৃন্দকে জননী সিংহাসনে বসাইব, নিজের ভাইয়ের
মুখকমল দেখিয়া পরের ভাইকে আত্ম দেহের হেস হারে সম্বন্ধিত করিল,
ইহাই ত সংসারের উদ্দেশ্য। “আমিহে”র জগদবিকাশই সংসারের মূল। এই
“আমিহে”র প্রসারেরই নাম স্বদেশপ্রেম। যিনি যত আমিহে-প্রসার
করিয়া পরকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারিবেন তিনি তত স্বদেশ
প্রেমিক। তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে কত শত অনাগা নিরাশ্রয় বিধবা
কন্যাদায়ে অর্জুরিত হইতেছে, যদি তোমরা একটুই স্বদেশপ্রেমিক হও
তবে সেই সমস্ত পাপের ধূলায় অন্ধ বালিকাদিগকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া
পবিত্র প্রেমের স্রব্দচন্দনে তাহাদিগকে অভিষিক্ত কর, দেখিবে এই স্বশান
ভূমি আবার সোণার অমরাবতীতে পরিণত হইবে। একটা মামুলীকথা
আছে “স্ত্রীভাগ্য ধন,” যদি তোমার স্ত্রীর ভাগ্য ধন থাকে ত অভি
দরিদ্র কন্যাকেও গৃহে আনিলে তাহার আগমনে তোমার সংসার সুখসমৃদ্ধির

সুখী আঁড়ি পারিজাতে সুশোভিত হইবে। রাণী রামমণি অভিদরিত্তের
কথা ছিলেন, তাঁহাকে যে সময়ে মধ্যাহ্নগৃহস্থ রাজচন্দ্র বিবাহ করিয়া
আনিলেন সেইসময় হইতেই অস্বাস্থ্যে স্বয়ং কমলাও রাজচন্দ্রের ঘরে
প্রবেশ করিলেন—ভিখারিণী রামমণি “রাণী” রামমণিতে পরিণত হইলেন।
অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্র মহাহবে সম্মুখে বীরব্রতীগণকে দেখিলেন তখন
গাওঁর পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—

ন কাশ্চে বিজয়ঃ কৃষ্ণ ন চ রাজাঃ সুখানিচ
ন শ্রেয়ে হুগুণশ্যামি ত্বয়া স্বরনমাহবে।”

হে বীরের যুবকগণ! তোমাদের পিতামাতাকে বলিতে
পার না যে, “হে পিতা! দেশের লোকের, স্বাধিকার এই জীবন সংগ্রামের
দিনে আমি তাহাদিগকে ধনপ্রাণে মারিয়া সুখী ও ঐশ্বর্যশালী হইতে চাহি
না? ভাগ দেখাও শূর্য দেখাও, দেখিব স্ত্রীর প্রেম তোমার দিকে
অতধারায় প্রাণহিত হইয়া প্রদানিত হইবে। দ্রৌপদী অজানাপাণ্ডবভ্রাতা
অপেক্ষা অর্জুনকে অত ভাল বাসিতেন কেন? অর্জুন বীর ছিলেন বলিয়াই
ত। যে কোমল সে কাঠারকেই ভাল বাসে। জীভাতি কোমল-স্বভাব,
তাহারা শূর্যসম্পন্ন পুরুষকেই ভাল বাসে। তুমি যদি সত্যমতাই স্ত্রীর
ভালবাসা পাঠিতে চাও, জড়তা পরিহার কর, অকুতোভয় হও, নির্ভীক
হও, তেজস্বী হও, বীরের আয় সমসার সমরাজ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পাকজগৎ
নিম্নাদে দিগ্দিগন্ত মুখরিত কর—বীরের আয় দেশবঙ্গে স্বাধীনবৃত্তির
বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া অর্ধোপার্জন কর—মসীজীবী না হইয়া
ব্যবসায়জীবী হও, দেখিবে শত শত নারীর ভক্তিশ্রদ্ধা-বিজড়িত নির্দীপ্য
তোমার চরণতলে লুটাইবে। যেখানে ত্বনপত্রাচ্ছদিত কুটীরে ছিন্নকস্থির
দেহ আবৃত করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা কঙ্কার মাতা রোরুহমানকণ্ঠে বসিয়া আছেন,
হে মহাশয় যুবকগণ, আজ সেই বজের কুটীরে যাইয়া তাঁহাদের পদধূলি
লইয়া মেঘমন্দ্রপরে বল—“আমরা বুঢ়াবো না তোঁর দুঃখ মানুষ আমরা
নহিত মেঘ।”

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ইতরতা ।

(পূর্বানুবৃত্তি ।)

একস্থানে এক মৃগ ও মৃগী চরিতেছিল, এক ব্যাধ মৃগীকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিল ; মৃগী নিজের যত্না উপেক্ষা করিয়া, ব্যাধ পাছে মৃগকে বধ করে এই চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল, কিন্তু মৃগের জন্মাবধি স্নদয়ে দুঃখ রহিয়া গেল, যে মৃগী বাণবিদ্ধা হইয়াও তাহার মঙ্গলের চিন্তা করিয়াছে—

“বিদ্ধা মৃগী ব্যাধশিলীমুখে
মৃগোহপি তৎ কাতরনীক্ৰণেন
অম্বুন্ পরিত্যজ্য গত ব্যাধামৌ
মৃগস্ত জন্মাবধিরাধিরামৌ ॥”

ইহাই ভালবাসা !

এক পর্কতের একস্থানে সাগাণ্ড জল ছিল ; এক মৃগ ও এক মৃগী তৃষ্ণার্ভ হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ; জল এত তল্প ছিল যে একটী পান করিলে অল্প পান করিতে পায় না ; উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করিল, তথাপি কেহ পান করিল না ! ইহাকে বলে ভালবাসা !

একটী সত্য ঘটনা বর্ণনা করিতেছি—নবদ্বীপের নিকট একটী গ্রামে একটী যুবক এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া পাবনায় গিয়াছিলেন । তিনি প্রতিদিন বৈকালে বেড়াইতে যাইতেন । একদিন গমনকালে বিতলে হারমণিয়মের বাজ ও সঙ্গীত হইতেছিল—যুবকটী তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন । নিকটের অল্প দ্বিতলে একটী বালিকা ঐ যুবককে দেখিয়া এত তন্ময় হইয়াছিলেন, যে দুইটা গান পরে হইয়াছিল তাহা শুনিতেই পান নাই, পরে যুবক চলিয়া গিয়াছিলেন । পুনরায় একদিন ভ্রমণকালে, সেই বালিকা বিতলের জানালায় বসিয়া উল্লুনিতে ছিলেন—যুবক তাহাকে দেখিয়াছিলেন । মধো মধো উভয়ের এই-রূপে সাক্ষাৎ চলিতেছিল । ক্রমে প্রকাশ হইল যে বালিকা যুবকের মধ্যম সছোদরের পত্নীর ভগ্নী । ক্রমে তথায় যুবকের নিমন্ত্রণ আরম্ভ হইল । একদিন নিমন্ত্রণে গিয়া আহারের পর যখন কেহ থাকে নাই তখন বাড়ীর নিকটে বাগানে বালিকা

ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন ; যুবকও তথায় গেলেন উভয়ে পরস্পরকে বিবাহ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা হইল। ক্রমে বালিকার বিবাহের কথা উত্থাপন হইলে বাটীর সকলে ঐ যুবকের সহিত বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। বালিকার পিতা কহিয়াছিলেন যে “একটা কুটুম্বিতা আছে; আর সেই স্থানে কুটুম্বিতা করিব না।” পরে অণ্ড স্থানে কণ্ঠার বিবাহ হইয়াছে। কণ্ঠা শশুরবাটীতে গিয়া সমস্ত দিন গৃহের কার্য্য করেন, কিন্তু রাত্রে পতির নিকট শয়ন করেন না। শাশুড়ীকে কহেন যে—“আপনার পুত্রের বিবাহ দেন।” নন্দকে কহেন যে “তোমার ভাইএর বিবাহ দাও, আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এক শয্যায় শয়ন করিব না।” ঐ যুবক এক স্থানে চাকরি করিতোছেন ঐ কণ্ঠা যুবককে মধ্য মধ্য পত্র দেন যে “তুমি বিয়ে কর, আমি শুমিয়া সুখী হইয়া মরিব যে তুমি সুখে আছ।” যুবক উত্তর দেন যে “আমি আর বিবাহ করিব না।” এইরূপে উভয়ের দিন চলিতেছে। কতদিনে যে উভয়ের দেহপাত হইবে ও উভয়ে সুখী হইবেন, তাহা লীলাময়ই জানেন। †

কামের অপূর্ণতায় হৃদয় সাহারার মরুভূমির স্থায় ধূ ধূ করিবে, কিন্তু প্রেমের তাহা নহে। তুমি আমায় ভাল না বাসিয়া সুখী আছ আমার তাহাতেই সুখ, কারণ তুমি সুখে আছ। তুমি আমায় কোন দ্রব্য না দিয়া সুখী আছ তাহাতেই আমার সুখ, কারণ তুমি সুখে আছ। রাণী শৈব্যা পতির ঋণমুক্তির জন্য

† পাঠক মহাশয়কে অনেকক্ষণ বিরক্ত করিলাম। এই ঘটনার আমিও অর্ধেক ভুলভোগী। আমাকেও একটা ত্রয়োদশবর্ষীয়া হেমাসী বালিকা বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু আমি তাহার প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া—তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছিলাম। কারণ তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, সে ত্রীলোক নিজে বিবাহ করিতে চাহে, সে পরে মানিবে না, তখন আমার জ্যেষ্ঠসহোদরের প্রথরভাৰ্য্যার বিষয় স্মরণ হইয়াছিল। ক্রমে স্বর্গের পদার্থ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে—যাতনা দিবার জন্য স্মৃতিটুকু রাখিয়া গিয়াছে। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত এ স্মৃতি আমায় পরিত্যাগ করিবে না। ছুঃখের কথা অন্যকে কহিলে ছুঃখ লাঘব হয়, তজ্জন্য সঙ্গদয়পাঠকের নিকট কহিলাম, কিন্তু ভুলভোগী ভিন্ন এ যাতনা বুঝিবেন না—

“বরষার কালে, সখি প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি ছুইপাশে, তেমতি যে মন
ছুঃখিত, ছুঃখের কথা কহে সে অপরে।”

মে-না-ব—৫র্থ সর্গে।

কষ্টকর দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, ইহাই ভালবাসা! আজকাল এরূপ স্ত্রী
চুলভ! মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি বাস্তবিক এরূপ স্ত্রীলাভ করিতে পারেন না—

“—————অনুরাগী।

যুবতিজনঃ খলু নাপ্যতেহনুরূপঃ ॥

ভারবিঃ ১০।৫০

মনের মত স্ত্রী নিশ্চয় পাওয়া যায় না। যতটুকু স্বার্থ ততটুকু “ভালবাসা”
(তাহার অন্য নাম নাই) ; এ ভালবাসা খুব পরীক্ষা করিতে হয়।

“দদর্গুওহর্ শাহদান্দ ইয়া বদান্দজওহরি”।

বাদসাহ কিম্বা জহুরি হীরা চিনিতে পারে—অন্যে নহে।

আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সবজজ ছিলেন—পত্নীকে অলঙ্কারে মুড়িয়াছিলেন,
কিন্তু তাঁহার পীড়িত শয্যায় তাঁহার পত্নী দ্বারে দাঁড়াইয়া নাকে কাপড় দিয়া কেবল
প্রাতঃকালে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন “কেঁমন আঁচ”—নরকের ছবি আর
কোথায়? দাদা সেই কথায় পাশ ফিরিয়া কাঁদিতেন! তাহা স্মরণ করিলে
এখনও আমার চক্ষে জল আসে। বন্ধু ও স্ত্রীকে অসময়ে জানা যায়—

ভাৰ্ঘ্যাং ক্ষৌণেযু বিস্তেষু ব্যগনেষু চ বান্ধবান্ ॥

যাহা হউক এক্ষণ প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করি। এ হেন ঋণ,—যাহার
গতি পরকালেও গিয়া থাকে, সেই ঋণ আইন অনুসারে তিন বৎসরের পর
তমাদি হইয়া থাকে। ধর্মভয় করিলে তমাদি হইলেও সে টাকা শোধ দেওয়া
কর্তব্য; কিন্তু এক্ষণ কয়জন সে ধর্মভয় করেন? তমাদি হইলে অনেকেই আনন্দ
প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ঋণ তমাদি করিবার উদ্দেশ্যে কোন অধার্মিক যদি
কোন ব্যবহারজীবির আশ্রয় গ্রহণ করেন ও যদি সেই ব্যবহারজীবী অর্থলোভে
অধর্মের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কি তিনি ভদ্রবেশে সাজিয়াই গুণ্ড
বলিয়া গণ্য হইবেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

পল্লীভবন ।

হে পল্লীভবন মোর ! হে রূপসী, হে সুন্দরী—চির-অমুপমা,
আনন্দের রমা নিকেতন ওগো, মেলি তব গায়া মনোরমা
টানিছ তোমার পানে অহর্নিশি অসমৃষ্ক-ক্ষুক লুক্ক চিত্ত মোর
সরল মধুর—প্রিয়-দিত্তে চির আন্তরিক ভালবাসা তোঁর ।
বিদেশে প্রাসাদবাসে-বিলাস বিলোলগেহে তোঁর মূর্তিখানি
হাস্তময়ী, লাস্তময়ী, সজ্জাশীনা, ওরে মোর হৃদয়ের রাণী !
আমোদ উৎসব মাঝে, পতাকাশোভিত-দীপোত্ত্বঙ্গ-রম্যমহে
জাগেরে মানসে মোর, বেদনার অশ্রুধারা নয়নেতে বহে ।
সুন্দর কুটীরখানি, শ্যামলিম পত্রগুচ্ছে-সবুজবসনে—
নাহি জানি চোখে মোর মাথায়েছ কিবা মারী মোহের অঞ্নে !
না ! না ! সে ত মোহ নয়—মোহ নয় কভু তাহা, সে যে স্নেহরস
পরম পবিত্রতমা-নন্দন চয়িত সুধা সঞ্চারি পরশ ।
আমার কুটীরখানি সে যে মোর আপনার—অতি আপনার,
কর্মলীন বিশ্বমাঝে সেই চালে চিত্তে বিজন শাস্তির ধার,
কল কোলাহল হ'তে ব্যস্ত কলরব হ'তে সেই মোরে শুধু
দেয় পিত্তে-বিজন আপন গেহে-অনাবিল-সমাধির মধু ।
বিশ্বের উৎসবদ্বারে-গীতিগন্ধেহন্দে-দীপমালিকার হারে
যেথায় অনন্তধাসি-পুলকর কলরব সাম্রাজ্য বিখারে,
সেথা তোঁর নাহি স্থান-গরীব কুটীর মোর, জানি তাহা জানি,
নিঃশব্দে নীরবে নিত্য-আহ মৌন মুক লাজে, মানি তাহা মানি,
তবু তই ওরে আপনার—চির আপনার পল্লীর ভবন !
তোঁরে ফেলি নাহি চাহি বিশ্বরাজ্য সুরিরাট-কাকন রতন ।

শ্রীমহিলাল দাস ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

(পূৰ্বানুবৃত্তি)

যস্যাম্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেবচ ।

ম বিমুক্ততি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্শ্ব ভামসী ॥ ৩৫

সাধয়ব্যাখ্যা । হে পার্শ্ব দুর্মেধাঃ (দুৰ্গা অবিবেকবহুলা মেধা যন্ত সঃ দুর্মেধা
অবিবেকী জনঃ) যস্য (ধৃত্যা) স্নপ্নং (নিদ্রাং) ভয়ং (ভ্রাসং) শোকং
(সন্তাপং) বিষাদং (বিষন্নতাং) মদং (বিষয়সেবাবহুলং আত্মনো বহুল-
জ্ঞানংমামং মদং) ন বিমুক্ততি (স্নপ্নাদিবন্ন বিমুক্ততি পুনরাবর্তয়তি) সা ধৃতিঃ
ভামসী । ৩৫

বঙ্গানুবাদ । দুৰ্নীক্ৰিয়াক্তি যে ধৃতি অবলম্বনে নিদ্রা, ভয় শোক
বিষাদ ও মস্ততা পরিত্যাগ করে না, তাহা ভামসী ধৃতি । ৩৫

আলোচনা । অবিবেকী ব্যক্তি যে ধৃতির বশে অতিনিদ্রা, সামান্য হেতুতে
ভ্রাস, ইচ্ছাবস্তুর নাশে শোক, অপ্ৰিয়কার্যে বিষন্নতা এবং বিষয়সুখভোগে
মস্ততা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাকে ভামসীধৃতি কহে । ভামসী ধৃতি
ঐহিক নিন্দা ও পারিত্রিক অধোগতির হেতু । ৩৫

সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখাস্তক নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যত্ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তত্ সুখং সাধ্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭

সাধয়ব্যাখ্যা । অথ সত্বাদিগুণভেদেন সুখস্য ত্রিবিধো ভেদ উচ্যতে ।
হে ভরতর্ষভ (অর্জুন) ইদানীং তু ত্রিবিধং (ত্রিপ্রকারং) সুখং মে (মম
সকাশাৎ) শৃণু (অবধারণ) (তত্র সাধ্বিকসুখমাহ) যত্র (যস্মিন্ সুখে)
অভ্যাসাৎ (নতু ধনসম্পাদে সুখমিব রাগাৎ) রমতে (রতিং প্রাপ্নোতি
রতিং প্রতিপত্ততে) দুঃখাস্তকং (দুঃখোপশমং) নিগচ্ছতি (নিশ্চয়েন চিরং
প্রাপ্নোতি) যৎ তৎ (সুখং) অগ্রে বিষমিব (দুঃখাত্মকং বমনিয়মান-
প্রাণায়ামাত্মারম্ভে আয়াসবাহুল্যাদর্শনাৎ) পরিণামে (জ্ঞান-বৈরাগ্যা-
ধ্বম নিয়মাত্ম্যানুভবং) সুখং অমৃতোপমং, আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং (আত্মবিক্রা

বুদ্ধিঃ তস্যাঃ প্রসাদঃ রজস্বমোত্যাগেন নিৰ্ম্মলহলাভঃ ততোজাতং তৎসুখং
সাধিকং প্রোক্তং (ভট্টকৈঃ) ৩৬ । ৩৭

বঙ্গাবুবাদ । হে অর্জুন, একগ আমার নিকট ত্রিবিধসুখের বিষয় জ্ঞান কর ।
যে সুখের ক্রম-অভ্যাগে দুঃখের চির অবসান হয়, এবং যে সুখ অভ্যাগ করিতে
অগ্রে বিষবৎ ক্লেশকর হইলোঁও পরিণামে অনৃততুল্য হয়, যে সুখ আত্মবুদ্ধির
নিৰ্ম্মলতা হইতে জন্মে, সেই সুখই সাধিকসুখ বলিয়া কথিত হয় । ৩৬ । ৩৭

আলোচনা । জ্ঞান-জ্ঞেয়-কর্তা-বুদ্ধি-ধৃতি গুণভেদে তিন প্রকার করিয়া
বলা হইয়াছে । এখন সুখের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন । সুখই
জীবের প্রার্থনীয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন সুখ গ্রাহ্য কোন সুখ ত্যাগ্য । কোন
সুখ পরিণামদুঃখজনক এবং কোন দুঃখ পরিণামসুখজনক—তাহাই একগ
বলিতেছেন । জগৎ সুখ দুঃখ মিশ্রিত । যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ
পরে দুঃখে পরিণত হয় না, অসতে তাদৃশ সুখ সুহৃৎ । এজন্য জ্ঞানীর
মত এই যে, অগ্রে কিছুকাল দুঃখভোগ করিয়া অনন্তকাল যে সুখভোগ
করা যায় তাহাই প্রকৃত সুখ । বিষয়ভোগজনিত সুখে আপাততঃ আনন্দ হয়
বটে, কিন্তু তাহা দুঃখমিশ্রিত এবং অস্থায়ী । তাহাতে কাহার বিতৃষ্ণা
জন্মে, কাহার ক্ষণভঙ্গুরসম্পাদনাশে পুনরায় দুঃখ উপস্থিত হয় । বিশেষ তাহা
ঐহিকের জন্য মাত্র । যাহা ঐহিক পারত্রিক উভয়ত্র হিতকর তাহাই অবলম্বনীয়
তাদৃশ সুখের অভিলাষী হইলে আপাতসুখকর বিষয়বাসনা হইতে মনকে
সংযত করিয়া শাস্ত্র ও গুরুপদেধে আশ্রয় করিয়া আত্মসম্পূর্ণক যমনিয়ম আসন
প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করিতে হয় । তদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান-বৈরাগ্য
লাভ হয়, দেহ ও আত্মার ভিন্নবোধ জন্মে । এই নিৰ্ম্মল আত্মবুদ্ধিজনিত
সুখই অমৃতোপম ব্রহ্মসুখ । এই সুখ ক্রমঅভ্যাগ দ্বারা লাভ করিতে
হয় । তাই বলিয়াছেন “অভ্যাগাৎ” । এই ব্রহ্মসুখই সাধিক সুখ । ইহা
সাধনসাপেক্ষ । ৩৬ । ৩৭

বিষয়েশ্চিয়সংযোগাদ্ বস্তুদগ্ৰেহমৃতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

সাধরব্যাখ্যা । বিষয়েশ্চিয়সংযোগাৎ (বিষয়ানাং ইশ্চিয়ৈঃ সংযোগাঃ চক্ষু-
কর্ণজিহ্বাপৃষ্ঠাদিসংসর্গাৎ) যৎ (সুখং) তৎ অগ্রে (প্রথমক্ৰমে) অমৃতো-
পমং (অমৃত সমং) পরিণামে বিষমিব (বিষতুল্যং দুঃখতৎসুখাৎ) তৎ সুখং
রাজসং স্মৃতম্ । ৩৮

বঙ্গানুবাদ। বিষয়—ইন্দ্রিয়-সংযোগে উৎপন্ন যে সুখ, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য বোধ হয়, পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর, তাহাই রাজস সুখ।

আলোচনা। পূর্বলোকে সাত্ত্বিকসুখের কথা বলা হইয়াছে। এখন রাজসিক সুখের কথা বলা হইতেছে। সাত্ত্বিক সুখ নিবৃত্তিমূলক, রাজসিক সুখ প্রবৃত্তিমূলক। সাত্ত্বিকসুখ ভোগের, রাজসিকসুখ ভোগের। ইন্দ্রিয় ও বিষয়সংযোগে জাত আপাততঃ অমৃতের ন্যায় শ্রীতিকর এবং পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর যে সুখ তাহাই রাজস সুখ। চক্ষু কণ নাসিকা চিহ্বা, স্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদ বাক্‌পারু উপস্থ কর্ণেন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ এবং গ্রহণ গমন ভোজন মলত্যাগ ও আনন্দ। উক্ত জ্ঞান ও কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় সংযোগের অন্তর্ভুক্তই মনের কার্য। এই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল-তৃপ্তিকর বিষয়ভোগের নাম সুখ। চক্ষুর অনুকূল ও তৃপ্তি সুরূপবস্তুর দর্শনে, কর্ণের তৃপ্তি সুস্বরগীতবাছাদিশ্রবণে। এইরূপে সুগন্ধ আশ্রানে, সুমধুররস আশ্বাদনে, সুকোমল দ্রব্যস্পর্শে এবং স্ত্রীসন্তোগাদিতে যে সুখ তাহাই বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজ সুখ এবং ইহাই রাজস সুখ। এই সুখলাভের জন্য যমনিয়ম আসন প্রণায়ামাদিধারা মন এবং ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিতে হয় না বলিয়া ইহা প্রথমে অমৃতোপম, কিন্তু জরার আক্রমণে যখন শরীর বিকল হয়—এই সকল সুখভোগে শরীরের সামর্থ্য থাকে না। সুখের মস্ততায় পারলৌকিক কোন চিন্তাই মনে থাকে না। এই সুখের অবসানে ভোক্তার ঐহিক পারত্রিক বহুদুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া এই রাজসিক সুখকে পরিণামে বিষবৎ বলা হইয়াছে। রাজসিক সুখের আর একটা মুখ্য দোষ এই যে, ইহার ভোগপিপাসা মিটে না, জলস্ত অগ্নিতে ঘৃতাভতির স্থায় ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। যখন শরীরে ভোগের শক্তি থাকে না, তখন শরীর বিয়ক্রিয়ার ন্যায় অনুভূতাপে দগ্ধ হয়। আপাতমধুর পরিণামবিষবৎ ঐদৃশ রাজস সুখভোগচেষ্টা বিবেকী জনের কর্তব্য নয়। ৩৮

যদগ্রেচানুবন্ধেচ সুখং মোহনমাত্মনঃ।

নিজ্রালস্ত্রপ্রমাদোথং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

সাধুরন্যাথ্যা। বৎ (সুখং) অগ্রে (প্রথমকালে) অনুবন্ধেচ (অবসানে উত্তরকালে পশ্চাদপি) আত্মনো মোহনং (আত্মবিষয়া যা বুদ্ধিঃ তস্তাঃ মোহকরং) নিজ্রালস্ত্রপ্রমাদোথং (নিজ্রালস্ত্রপ্রমাদেভ্যঃ সমুৎপন্নং) তৎসুখংতামসং উদাহৃতম্ ॥ ৩৯

বজ্রানুবাদ । যে সুখ প্রথমে ও শেষে আত্মবিষয়ে বুদ্ধিকে মুগ্ধ করে এবং নিদ্রা আলস্য ও অনবধানতা হইতে জন্মে, সেই সুখ তামসসুখ বলিয়া কথিত হয় । ৫৯

আলোচনা । যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে আত্মজ্ঞানের বিরোধী, নিদ্রা আলস্য ও শ্রমাদ হইতে বাহ্য উৎপন্ন হয়, তাহাই তামস সুখ । বিবেক বিচারধারা কর্তব্য নির্ণয় হয় । বাহ্যের আলস্য ও নিদ্রার বশীভূত, তাহার সর্বদা অনবধান । এজন্যই তাহাদের পরিচালক আলস্য নিদ্রা ও অনবধানতায় তাহাদের জ্ঞান অভিভূত থাকে । এই আলস্য নিদ্রা ও অনবধানতা হইতে যে সুখ জন্মে তাহাই তামস সুখ । বিষয়সম্পন্ন ধন পরিজন সকলই আছে—আলস্যবশতঃ যথাযথ কর্মে নিয়োগ করা হয় না । অবসরের যে সুখ, নিদ্রাতুর ব্যক্তির নিম্নলিখিতনেত্রে থাকিয়া যে সুখ ভোগ করে, তাহাই তামস সুখ । একটি গল্প আছে—তুইজন পক্ষ অহিফেনসেবী (গুলিখোর) মত্ততার অবসাদে তন্দ্রাঘোরে শয়ন করিয়া আছেন । এদিকে শরীরে সূর্য্যতাপ লাগিয়াছে—ভঠরে ক্ষুধানল জ্বলিয়াছে, তথাপি উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে না । একজন অর্ধ নিম্নলিখিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন “কত রবি জ্বলে” অন্য উত্তর করিলেন—“কেবা আখি মেলে” অর্থাৎ জিজ্ঞাসা হইল কত বেলা হইয়াছে ? উত্তর হইল, কে চক্ষু মেলিয়া দেখে । আলস্য নিদ্রায় চক্ষু বন্ধিয়া থাকাই ইত্যাদের সুখ । নিদ্রা ও আলস্যে যে সুখ তাহাই তামসসুখের সহজ দৃষ্টান্ত । ৫৯

নতদস্তি পৃথিব্যাং বা দিব্যদেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্মাৎত্রিভিঃ শূনৈঃ ॥ ৪০

সাধয়ব্যাখ্যা । পৃথিব্যাং বা (ভূলোকে বা শব্দাৎ পাতালেচ) পুনঃ (এবং) দিব্যি (স্বর্গে) দেবেষু (দেবতাদিষু) (তৎ তাদৃশং) সত্ত্বং (প্রাণিজাতং) ন অস্তি যৎ প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিসম্ভবৈঃ প্রকৃতিসমুৎপন্নৈঃ) এভিঃ (সর্বাদিভিঃ) ত্রিভিঃ শূনৈর্মুক্তং স্মাৎ ॥ ৪০

বজ্রানুবাদ । পৃথিবীতে বা স্বর্গে কিম্বা দেবতাদিগের মধ্যে এমন প্রাণী নাই বাহাতে প্রকৃতিজাত সর্বাদি এই তিন গুণ নাই । ৪০

আলোচনা । পরমাত্মা ব্যতীত সকলই সর্বাদিত্রিগুণাত্মক । গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, বৈষম্যাবস্থাই সৃষ্টি ; সূত্রায়ং সৃষ্টিপদার্থমাত্রেই ত্রিগুণযুক্ত । স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক লতা গুল্ম বাবতীয় সৃষ্টি

বস্তুই সব রসঃ তমঃ এই ত্রিগুণায়ুঃ। কোনবস্তুই এই ত্রিগুণ হইছে
মুক্ত নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূর্গাচরণ দামস্তম্ভ।

ভক্তি-কথা ।

(পূর্বাশ্রুতি)

তদ্ব্যয়িণ্যর্গো জনভাষ্যবিল্লমো,

যস্মিন প্রতিশ্লোকমবন্ধনতাপি ।

নামাস্তনস্তম্ভ যশোহঙ্কিতানি যঃ

শৃণুস্তি গায়স্তি গৃণুস্তি সাধনঃ । ভা ১।৫।১১

যে বাক্যে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের যশঃ অঙ্কিত নাম বিদ্যস্ত আছে, তাহা বাক্যরূপাদি-
মোষ-ভুট্ট হইলেও সেই বাক্য উচ্চারণমাত্রেই জনসমূহের পাপের নিনাশ
করে। সাধু-সহায়ারা, সতত সেই অনন্তগুণাকরের গুণ শ্রবণ, কীর্তন
করেন এবং স্বয়ং বলিতে থাকেন। ভাগবতচূড়ামণি, মহর্ষি নারদের এই উপ-
দেশ মস্তকে বহন করিয়া সাদৃশ মুঢ়, অসাধাসাধনে ত্রুটি হইয়াছে। যে ভগবান্
শ্রীচরিত্র নাম-মাহাত্ম্য স্বয়ং ভগবান্ও বলিতে অক্ষম, সে বিষয়ে ক্ষুদ্রশক্তি
মানবের প্রয়াস করা বাতুলতা মাত্র। তবে বাহার বাগযন্ত্র আছে, সেই কিছু
শব্দ করে; সেই সূত্রে এ অধম কিকিম্মাত্র মধুর ভগবন্নাম রসনায় গ্রহণ
করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

প্রাণবল্লভের বাঁধা বীণা, তাঁর গুণগানে যদি রত থাকে, তবেই তাঁর জীবন
সফল। তাহা হইলেই রসময়ের রসাস্বদক্রম্য তাঁর জনম সফল হইবে,
নচেৎ তেজস্বিতুল্য মনে করিব। যাঁর জন্য আসা, যাঁর জন্য প্রাণের
আশা, তাঁহাকে ভুলে থাকা অপেক্ষা চূর্তাগ্য আর কি আছে? যাঁকে চাই,
তিনি ছদয়েই আছেন, অস্মি অন্ধ বলিয়া দেখিতে পাই না। অচূর্ততাব-
বর্জিত, জ্ঞান, কর্ম, যাগ, যোগ সমস্তই বৃণা। অনন্ত্যন্তভগবন্নামশ্রবণে
মানবের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই। নামে রুচি জন্মবার জন্য প্রথমতঃ পূর্বাশ্রুতসেবা

কিঁতে হয়, তার ফলে, সাধুসঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে । তার ফলে শ্রীহরির নামাদিতে ঐচ্ছা জন্মে, তার পর নামে রুচি জন্মে । তীর্থসেবা, সংসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বিগতশাপ শুদ্ধিত না হইলে সহজে ঐচ্ছা ও রুচি জন্মে না । ধর্মের মুখ্যফল, ভগবৎ সাক্ষাৎকার, গৌণফল চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি । যতদিন সেই একমাত্র প্রেমপাত্র গোবিন্দের দর্শন না মিলিবে, ততদিন ধর্ম আনুষ্ঠানিক ব্যাপারমাত্র । যতদিন সেই প্রেমসিদ্ধির প্রতি চিত্ত ধাবিত না হইবে, তাঁর নামে রুচি না জন্মিবে, ততদিন ধর্মচরণ পশুশ্রমমাত্র । তিনদিন যতদিন প্রেমসিদ্ধিতে না মিশিবে- ততদিন কিছুতেই শান্ত হইবে না । শাস্তি-পুরে উপনীত না হইলে অদ্বৈতের দর্শন মিলিবে না । আমরা ভগবৎবিমুখ, বিষয়াস্বাদলোলুপ, সুতরাং দৃঢ়শক্তিপ্রভাবে মন না বাঁধিতে পারিলে, শাস্তি-পুরে প্রবেশ করা অসম্ভব । অশাস্তচিত্তব্যক্তির সুখ কোথায় ?

সঠিক পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহেতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মাসুপ্রসীদতি ॥

যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দে মতি, রতি জন্মে, তাহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠধর্ম । যাহা হইতে তারপ্রতি ভক্তি জন্মে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যাহা হইতে আত্মা সর্বতোভাবে প্রসন্ন ও শান্ত হয় । সেইভক্তিকোনরূপ বিরূ হইতে বাধা প্রাপ্ত হয় না—তাহার গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারে না । ভক্তিই ভগবৎসীকারিণী শক্তি, একমাত্র ভক্তিগুণেই ভগবানকে বাঁধা যায়, অন্য কোন সাধনে তাহা ঘটে না ।

অকপটভাবে ঐধরাসুগন্ধানই ভক্তিযোগ । শ্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও সমাপ্তি । যুহুর্ষহাদী ভগবৎপ্রোগায়ত্ত্বাও শান্তি মুক্তির প্রসূতি । জীৱ এতল্লাভে সর্বভূক্তে প্রেমগান্ ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তুষ্টি লাভ করে । এই প্রেমের দ্বারা কোন কাব্যবস্তু লাভ হইতে পারে না । কারণ, বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না । ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতর," কারণ সাধ্যবিশেষই উহার লক্ষ্য ; কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা । সাধারণ লোকের সংস্কার ভক্তি ও জ্ঞান অতিশয় পৃথক বস্তু ; বাস্তবিক তাহা নহে । ভক্তিযোগে এক বিশেষসুবিধা, উহা আমাদের চরণ লক্ষ্য ঐধরে পঁহুছিবার অতিসহজ ও স্বাভাবিক পন্থা । কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেকসময়ে জ্ঞানকে সৌভাগ্যের আকার ধারণ করে । তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই

আছে, এই অবস্থার নাম গোণী। উহা একটু পরিপক্ব হইয়া পরাভক্তিরূপে পরিণত হইলে আর কোনও আশঙ্কা থাকে না। পরাভক্তিতে অভিত্যক্ত ব্যক্তি আর কখনও অপরের প্রতি ঘৃণাভাব বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপ চইতে পারে না।

এ জীবনেই সকলেই যে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্রগঠন করিবে, তাহা সম্ভব নহে। তবে আমরা জানি, যে চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমভাবে বিরাজমান, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উচ্চদরের। পাখীর উড়িতে তিনটি ক্রিয়ের আবশ্যক, দুটি পক্ষ ও চালাইবার হাল স্বরূপ একটা পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, যোগ উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য পুচ্ছস্বরূপ। ঘাঁহারা এই তিনরূপ সাধনপ্রণালী একসঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ভক্তিই একমাত্র পথস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাদের পক্ষে এটি সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাৱশ্যকীয় হইলেও তাহাদের উপযোগিতা কেবল ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়া দেওয়া মাত্র। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের উপদেষ্টগণের মধ্যে একটু সামান্য মতভেদ আছে। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য দুই বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, এ প্রভেদ নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সাধনস্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনা মাত্র বুরায়। আর নিম্নস্তরের এই উপাসনাই একটু অগ্রসর হইলে উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভেদভাব ধারণ করে। কারণ পূর্ণভক্তির উদয়ে প্রকৃতজ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে। আর পূর্ণজ্ঞানের সহিত ভক্তিরও প্রকৃত অভেদ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পতি বিদেশে গমন করিলে, পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী যেমন নিরন্তর পতিকে ধ্যান করে, ঈশ্বরের প্রতি তাদৃশ অবিছিন্ন ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাই ভক্তি নামে খ্যাত হয়। রামানুজ বলেন, “একপাত্র হইতে অপর-পাত্রে নিষ্কিপ্ত অবিছিন্নতৈলধারার মত প্রবাহিত ধোয়বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান।” যখন এমত ভগবৎস্মৃতির অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়। বেদান্ত সূত্র। ৪র্থ অধ্যায় ১ম পাদ, প্রথম সূত্র, শঙ্করভাষ্য। ভবতি চ স্মৃতির্ভাবনাপ্রকর্ষাৎ দর্শনরূপতা। ভাবনার প্রবলতা-নিবন্ধন স্মৃতিই দর্শনের অর্থাৎ প্রত্যক্ষের তুল্য হয়। আর উপাসনার অর্থও সর্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভগবান্কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাস

বাসিতে হইবে। কারণ, ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, যাঁহারা আমাতে নির-
স্তর আসক্ত আমিও তাহাদের প্রতি সেইরূপ আসক্ত। যদিও ভগবান্
সর্বভূতের জীবনস্বরূপ, তথাপি ভক্তরূপে তিনি সমধিক প্রকট হইয়া ভক্তের
বাসনা পূর্ণ করেন। আমরা ভাবি তিনি আমাদের ক্রন্দন শুনিতে পাননা,
সেটা আমাদের ভ্রমধারণা। তিনি সখুদিগের দুঃখবিমোচনার্থ এবং পাপি-
দিগের বিনাশের নিমিত্ত, উপযুক্ত সময়েই প্রচ্ছন্নমূর্তিতে এই জগতে দেখা
দিয়া থাকেন। তাঁরমত গরম কারুনিক বিতীয় নাই। তাঁহাকে উপলক্ষ
করা কি সর্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় নহে? ইহাই কি জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়োজন
নহে? এমন লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। যাঁহারা
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা মানবকে পাশদক্ষ দিতে পারে, তাহার
বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। ধর্মই বল, আর ঈশ্বরই বল,
যদি তাহা হইতে, সুখ, অর্থ না পাওয়া যায়, তবে, তাহাতে কোন প্রয়োজন
নাই। তাঁহাদের হৃদয়ে উচ্চতরগিষয়ের ব্যাকুলতা জন্মিতেও বহুদূর
লাগিবে। যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি অনোধ শিশুর ক্রীড়াপ্রায়
নোধ হয়, তাহাদের চক্ষে ভগবান্ ও ভগবৎপ্রেমই জীবনের সর্বোচ্চ
প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় যার ভোগ লালসা পূর্ণ, এজগতে এমন
মহাত্মা বিরল নহে। যাঁহারা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রাণপ্রতিমপুত্রলিকাগুলি
অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারেন। তাঁহারা স্বীয় জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান
করেন। প্রেমের এমনি একটা মাদকতা শক্তি আছে, যাঁহারা প্রভাবে,
মানব সংসারের সগুস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল
হইতে মানব প্রকৃতির নির্ধূরতাড়না প্রাপ্ত হইয়া সকাঙরে পরিভ্রমি বলিয়া
কোন অজ্ঞাতপুরুষের নিকট দয়া শিক্ষা করিয়াছে। প্রকৃতির আবরণ
উন্মোচন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অদম্য অধ্যবসায় বলে শেষে মানব
জানিতে সক্ষম হইয়াছে, যে, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ না ঘুচিলে দুঃখ দূর
হইবে না। সেই দুঃখ পরিহারের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চলিতেছে। সেই
জন্যই সাধনের আবশ্যক। ভক্তি মার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায়
কতকগুলি বাহ্যসহায় না হইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্মের পৌরা-
নিক ও রূপকভাগ আপনা আপনি আসিয়া থাকে ও উন্নতিকামী আত্মাকে
ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আরও ইহা একটা বিশেষ
উপায় করিবার বিষয়, যে, যে সকল ধর্মপ্রণালী পৌরাণিকতাবহুল ও

অমুঠান ও চুর, সেই সকল ধর্ম সম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন । যে সকল শুক গোড়ামিপূর্ণধর্মপ্রণালীতে, যাহা কিছু কবিহয়, যাহা কিছু স্তম্ভ, যাহা কিছু মহান্, যাহা ভগবৎপথে স্থলিতপদে অগ্রসরসুকুমার-মনের দৃঢ় অবলম্বনস্বরূপ, সেইভাবগুলিকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করিতে চাহে । যে সকল প্রণালীতে ধর্মের অবলম্বন স্তম্ভগুলিকে পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে ও সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণধারণা লইয়া, যাহা কিছু জীবনীশক্তি সঞ্চারক, যাহা কিছু মানব আত্মারূপক্ষেত্র উৎপত্তমান ধর্মরূপলতিকার গঠনোপযোগী উপাদান, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দূর করিয়া দিতে চাহে, সেই সকল ধর্মে শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, অন্তঃসারশূণ্য একটা আধারমাত্র,—গনস্ত শব্দরাশিও তর্কীভাসের স্তূপমাত্র । হয়ত একটু সামাজিক আবর্জনা নিরাকরণ বা তথাকথিত সংস্কারপ্রিয়তার গন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । তাহাদের ধর্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী । তাহাদের ঐহিক পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ, উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনেরলক্ষ্য, এই অজ্ঞান গোড়ামীর অদ্ভুত মিশ্রণরূপ-মতাবলম্বিগণ যতশীঘ্র তাহাদের প্রকৃতবেশে বাহির হইয়া নাস্তিক ও জড়বাদিদিগের দলে যোগদেয় ততই সংসারের মঙ্গল । একহিন্দু ধর্মামুঠান ও অপরোক্ষামুভূতি, রাশি রাশি বাক্-প্রপঞ্চ ও মূর্ণমূলভ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে সহস্রাণ্ডে গরীয়সী । অজ্ঞান ও গোড়ামীর শুকপুলিময়ক্ষেত্রে একজন,—কেবলমাত্র একজন জমিতভেজা ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিতে পার ? না পার চুপ্-কর । হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দাও, সত্যের বিমলালোক প্রবেশ করুক । নিজের জন্ত মানব নিম্নেই দায়ী । অশ্রুকে প্রভারিত করিয়া স্বীয় স্বার্থ বা ধন-প্রয়ামিধূর্তেরা অনেক সময়, নিজেই প্রভারিত হয় বা নিহত-হয় । এই পৃথিবীতে ধর্মের ধরকা উড়াইয়া কতশত ব্যক্তি, প্রভারণার জাল পাতিয়া নিরীহ, সরল প্রকৃতি নরনারীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইচ্ছা নাই । এইমাত্র করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত নহে, তাহারা সতত নিজের দল পুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত আছে । এই সংসারে অধিক সংখ্যক লোকই অধঃপতিত । তাহার কারণ, তাহারা ধর্মের বাঈধের বিখাস স্থাপন করেনা । প্রেমবান্ ব্যক্তি স্বভাবতই অস্রোহী ও সর্বভূতে দয়ীবান্ । অধার্মিক ব্যক্তি-রাই উচ্ছ্বেল স্বভাব হইয়া থাকেনা স্তুরাং ধর্ম, অর্থ বা মুখ না দিলেও অগতির কড়টা উপকার সাধন করে, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতে পারে ।

ধর্ম, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানবের ভিত্তিসাধন করে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। আদর্শচরিত্রলাভ ধর্মের একটা আনুসঙ্গিক ফল।

যদিও সকল আত্মাই এক সময় পূর্ণতা লাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত; তাহা হইলেও সাধনের আবশ্যক আছে। আমরা এখন যাহা তাহা আমা-দিগের অভীষ্টচিন্তারামির ও কার্যের ফলস্বরূপ। আর একপে যেমন চিন্তাও কার্য করিতেছি ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের তদন্ত গঠন করিতেছি বলিয়া যে, আমাদের বাহির হইতে কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই এমনত নহে। যখন আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হই, তখন আত্মার উচ্চতরশক্তি ও আপাত অব্যক্তভাবগুলি ফুটিয়া উঠে। আধ্যাত্মিকজীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি সম্ভব হয়, ও অংশেবে সাধক শুদ্ধ স্বভাবও সিদ্ধ হইয়া যায়। এই "সঞ্জীবনীশক্তি" গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতেই সাহায্য পাইতে পারে। আমরা সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুা একজন বুদ্ধি-জীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই।

বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমরা খুব শিক্ষিত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাক্যবিগ্নাসে নিপুণ হইলেও প্রভূতধর্মভাবে জীবন সাপন করিবার সময় প্রভূত নূনতা লক্ষিত হয়। তাহার কারণ, গ্রন্থাংশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিপক্ষে পর্যাপ্ত নহে। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তিসম্কার আবশ্যক। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মার শক্তিসম্কার হয় তাহাকে গুরু বলা যায়। যিনি শক্তিসম্কার করিবেন তাঁর এই শক্তি থাকা আবশ্যক। আর বাহ্যতে শক্তিসম্কারিত হয় তাহারও গ্রন্থের শক্তি থাকা আবশ্যক। ভূমি সুকর্মিত হওয়া আবশ্যক, বীজও সতেজ হওয়া আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টাই বিদ্যমান, সেখানে ধর্মের অপূর্ণ বিকাশ। ধর্মের প্রকৃত বক্তা ও আশ্চর্য্য শ্রোতারও সুনিপুণ হওয়া আবশ্যক।

যখন উভয়েই আশ্চর্য্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে। ইহাই ধর্মের যথার্থ প্রতিষ্ঠা, অত্র সকলে ধর্ম লইয়া ধূলি খেলা করে মাত্র। তাহাদের একটু কোতূহল একটু জানিবার উচ্ছা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মচক্রবালের বহির্দেশে রহিয়াছে। যাহা

হইতে আত্মোন্নতি না হয়, তাহা লইয়া ধূলিখেলা করিয়া সময়ান্তিপাত করা মূর্থতা মাত্র। তবে এ বিষয়ে কোঁক থাকি মন্দ নহে, কারণ সময়ে উহা হইতেই প্রকৃতধর্মপিপাসা আসিতে পারে। আর প্রকৃতির এমনই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ আসিবে, আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্মপিপাসা প্রবল হইবে, তখনই শক্তিসংকরক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন। তবে পথে কতকগুলি মহাবিপত্ত আছে। ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেকসময়ে এরূপ দেখা যায়, হয়ত কাহাকে খুব ভাল ঘাসিতাম; তাহার মৃত্যু হইল,—আঘাত পাইলাম। মনে হইল, যাহা ধরিতেছি তাহাই হাত ফস্কাইয়া পলাইতেছে, এক্ষণে কোন দৃঢ়তর আশ্রয় আবশ্যক, ধার্মিক হওয়া আবশ্যক। কয়েকদিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল। আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্মপিপাসা বলিয়া ভ্রমে পড়িতেছি। কিন্তু যতদিন ক্ষণস্থায়ী এই ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্মপিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্মের জন্য প্রাণের স্থায়ী ব্যাকুলতা জন্মিবে না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্যজ্ঞানের জন্য এই চেষ্টা বৃথা হইতেছে, তখন এইরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজের অন্তরের অন্তস্থলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত যে, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কিনা। এরূপ করিলে অধিকাংশস্থলে আমরা দেখিব আমরা সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নহি, প্রকৃত ধর্মপিপাসা আমাদের হয় নাই।

জীবোদ্ধারের জন্য লোকগুরুর আগমন হইলে আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করেন, যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্যালোক পাতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সত্য, স্বতঃপ্রমাণ,—উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই, উহা স্বপ্রকাশ। উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তস্থলে প্রবেশ করে, উহার সমক্ষে সমস্তজগৎ দাঁড়াইয়া বলে ইহাই সত্য। যে সকল আচার্য্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্যালোকের স্রাব প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ। আর জগতের অধিকাংশ লোকেই তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত তলজ্ঞানিগণের নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য পাইতে পারি। কিন্তু

আমরা অস্তুরের সহিত যে বস্তু অমুসন্ধান না করি, তাহা পাই না। ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা বড় কঠিন ব্যাপার। উহা আমরা ষত সোজা মনে করি, তত সহজ নহে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণে ব্যাকুলতা জাগরিত না হয়—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে না পারি, ততদিন সর্ব্বদা অভ্যাস ও পাশবপ্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যিক। উহা দুই এক দিনের কর্ম্ম নহে; কতিপয় বর্ষ বা কতিপয় জন্মেরও কর্ম্ম নহে; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে পারে। সিদ্ধিলাভ কাহারও গক্ষে অল্পকালেও ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্তকালও অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ধৈর্যের সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা আবশ্যিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুনাথ বিদ্যাতৃষণ কান্যতীর্থ।

যুদ্ধযজ্ঞ ।

যুদ্ধসম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষে কতদূর বিশুদ্ধনীতি প্রচলিত ছিল এবং তদনুগারে ভারতের রাজশুভর্গ কিরূপ প্রণালীতে আপনাদিগকে পরিচালিত করিতেন তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পঞ্চমহল্ল বৎসর পূর্ব্বের ভারতের আর্য্যগণ চিন্ময়ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে যেমন সন্মত হইয়াছিলেন, এবং তদনুকূলে যেমন বিবিধ দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহাদের অসীম পারদর্শিতা ছিল। পণ্ডিতেরা মানবের জ্ঞানকে সম্পাত্ত ও আঞ্জানিক এই দুই নামে অভিহিত করেন; অভ্যাস ব্যতিরেকেও যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতির জ্ঞান-তাহা আঞ্জানিক, আর যাহা অভ্যাসদ্বারা বা শিক্ষালাতদ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা সম্পাত্ত; এই সম্পাত্তজ্ঞান আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা (১) জ্ঞান ও (২) বিজ্ঞান; পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "মোক্শে ধৌজ্ঞানিগম্মজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।" মোক্ষবিষয়কজ্ঞানই জ্ঞান; আর শিল্প বা বস্তুশক্তি ধৌ

জ্ঞানের বিষয় তাহার নাম বিজ্ঞান এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্র বিজ্ঞানশাস্ত্র নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

মহাভারত হইতে একটা আখ্যায়িকা উক্ত হইতেছে; উহার আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা হইবে পঞ্চমহাযুগে কিম্বা ততোধিক মহত্ব বৎসর পূর্বেও আখ্যা-বর্ষবাসী ভারতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রে সমুন্নত ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন; সমরক্ষেত্রে তাঁহারা যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহার আলোচনা করিলে জানা যায় যে তাঁহারা বিভিন্ন রসায়নব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিলেন; অস্ত্রদেহেও তাঁহারা বহুপ্রকার ক্ষারসলিল প্রয়োগ করিতেন, ক্ষারসলিলদ্বারা পীত এই সমস্ত অস্ত্র নিষ্কিপ্ত হইবাগাত্র আকাশ জ্বলিয়া উঠিত।

এই আখ্যায়িকা মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উল্লেখ করেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরশরায় সমানীন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যেসমস্ত যোদ্ধা সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, যাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধভূমিতে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা যুদ্ধের পর কোন্ লোক গমন করেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও প্রবীণযোদ্ধা ভীষ্ম একটা আখ্যায়িকা বলেন।

আখ্যানের মর্ম্ম এইরূপ, রাজা অশ্বরীষ স্বকৃতপুণ্যফলে স্বর্গে গমন করেন, তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সেনাপতি 'সুদেব' তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ আসনে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখনই তিনি ইন্দ্রকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সুদেব আমার স্থায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিক ও পুণ্যাত্মা না হইলেও কিরূপে আমি অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন? ইন্দ্র উত্তর করিলেন তাত! আপনার সেনাপতি সুদেব অনেকানেক সুমহান্ সংগ্রামযজ্ঞ বিস্তার করিয়াছেন। "তিনি আরও বলিলেন" অশ্বরীষ, আমি দস্ত, বৃত্ত, শাক, বিরোচন, দুর্বার্ধ্য নমুচি, নৈকুগার, শশ্বর দৈতেয়, বিপ্রচিন্তি, সমুদায় দশুপুত্র ও প্রহ্লাদকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দেবগণের অধিপতি হইয়াছি। অশ্বরীষ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন" হে শতক্রতো, সংগ্রামযজ্ঞে হবিঃ কি? আজ্য কি? দক্ষিণা কি? ও ঋত্বিগ্ কাহাকে বলে? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আখ্যায়িকার প্রাচীন ভারতীয়গণ যুদ্ধকে ধর্ম্ম বা কর্তব্যকার্য্যস্বরূপ বিবেচনা করিতেন; যুদ্ধকার্য্য পবিত্র, যুদ্ধভূমি পবিত্র, যুদ্ধ ক্রিয়ের পক্ষে স্রাব্যধর্ম্ম, ধর্ম্মসংরক্ষণের প্রতিকূলে যখন অবশ্যস্ত্রাবী কারণপরম্পরা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন প্রাণপাত করিয়া সেই পুণ্য,

সেই ধর্ম বজায় রাখিতে হয়, সুতরাং শ্রাযাধর্মসংরক্ষণের যে চেষ্টা তাহাই যথার্থ যুদ্ধ। অতএব প্রাচীনকালের যুদ্ধে কোন ভয়ের কারণ ছিল না, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবাসীর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তাঁহারা ভাবিতেন প্রাণত্যাগ ঘটিলে বহুবিধ সুবিধানপূর্ণ স্বর্গরাজ্যে বাস অনশ্চিন্ত্য। গা এইজন্ত প্রাচীন ভারতবাসী যুদ্ধকে যজ্ঞস্বরূপে বিবেচনা করিতেন, যজ্ঞে যেমন হবি, আজ্য, ঋত্বিগ্ হোতা, অধ্যক্ষ অক্, প্রভৃতির প্রয়োজন হয় সেইরূপ যুদ্ধযজ্ঞেও কুঞ্জরসকল ঋত্বিক্। বাজিগণ অধ্যক্ষ পরমাংস হবিঃ এবং কধিরাদি আজ্যাদিরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধ বা মহাসমরকে প্রাচীন ভারতগণ মহাসাগররূপেও সময়ে সময়ে বলনা করিয়াছেন, যুদ্ধভূমিতে যে সমস্ত মহারণী, অর্দ্ধিরণী, অর্দ্ধিরণ প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা সাগরস্থিত তিমিঙ্গিলের স্থায়: যুদ্ধভূমি এত নিষ্ঠুরদৃশ্য পরিপূর্ণ হইলেও কিরূপে প্রাচীন ভারতগণ ইহাতে আনন্দবোধ করিতেন। তাহা সূক্ষ্মদর্শি গুণ্ডগণ ভিন্ন অপর কেহ এ উত্তর আলোচনা করিয়া কোনরূপ পুণ্যসিকান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; যুদ্ধভূমি হাহাকারে পরিপূর্ণ; কখন যুদ্ধভূমি অগ্নিগয় হইয়া উঠিতেছে, কখন অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, কখন বা জলময় হইয়া যাইতেছে, কখন বা মেনাসমূহ পাশ্চারা হস্তপদাদি অস্ত্রপ্রত্যঙ্গ আনক হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে,— কখন অস্ত্রপ্রভাবে নুগাইয়া পড়িতেছে, কখন বা জ্বন্তন ত্যাগ করিতে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, কখন বা ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে মুহূর্ত্তনধো স্বর্গলাভ করিতেছে— এই সমস্তদৃশ্য সত্তত ঘটতেছে বলিয়া যুদ্ধভূমি করুণদৃশ্যে সর্বদা পরিপূর্ণ; তাহাই হইলেও যুদ্ধভূমি ধর্মক্ষেত্র; এই ধর্মক্ষেত্রে যে সকল যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সে যাহা হউক এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহাও বোধ হইবে; তাঁহারা বিবিধ রসায়ন ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিলেন; তাঁহারা বিবিধ কারসলিল প্রণয়ন করিতেন, এই সমস্ত কারসলিল অস্ত্রসমূহকে পান করাইতেন, বা বিবিধ অস্ত্র দেহে প্রয়োগ

(৭) মহাভারতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইন্দ্রমুখে বলিয়াছেন, শূরপুরুষ সংগ্রামে হত হইলে তাঁহার জন্ত কদাচ শোক করিতে নাই, কেননা, সংগ্রামহত শূর অশোচ্য হইলে সম্মানভাজন হইয়া থাকেন, সমরহত পুরুষের উদ্দেশে পিতৃদান, উদকক্রিরা, স্নান ও অশৌচের বিধি নাই।”

করিতেন, প্রাস, শক্তি, পাশুপত জুস্তক, প্রস্রাব, বজ্র, নালিক, শতঘ্নী, প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রব্যবহার প্রচলিত ছিল; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অস্ত্র 'ব্রহ্মাস্ত্র' নামে অভিহিত হইত; এই ব্রহ্মাস্ত্র তড়িৎময়; মহামুনি দধীচি নিজের সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনাবলে এই তড়িৎময় অস্ত্রের আবিষ্কার ছিলেন, এবং বিবিধকৌশলে পূর্ণ বজ্রনামক মহাস্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই আখ্যানের প্রাসনামক অস্ত্রের বিশেষণগুলি ধীরতাবে আলোচনা করিলে বোধ হইবে যে তাঁহারা অস্ত্রনীতি বা অস্ত্রশাস্ত্র নির্মাণ প্রণালীতেও বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; অস্ত্রদেহেও বিবিধ রসায়ন সংমিশ্রণে উহার প্রভাব ও শক্তি আরও বর্ধিত করিতেন;

১। প্রাসনামক অস্ত্রের বিশেষণ

- (১) জলন্ত, শাণিত, ক্ষারসলিলদ্বারা পীত প্রাস
- (২) শৈক্যায়সময়, সূতীক, জ্বলিত, শাণিত প্রাস

২। সায়কের বিশেষণ

- (১) চাপবেগে আয়ত, তীক্ষ্ণ, পরকায়াভেদী, ঋজু, শাণিত, পীতমহান্ সায়ক

৩। খড়্গের বিশেষণ

- (১) দীপিচর্ম্মদ্বারা আনক, নাগদন্ত নির্মিত মুষ্টিযুক্ত, হস্তিহস্তবিদারী, খড়্গ।

প্রাস নামক অস্ত্র 'শৈক্যায়সময়'—শিক বা বহুবিধ লৌহফলা পূর্ণ; ইহাতে বুঝা যায় এই কুণ্ডাস্ত্র বা তল্লাস্ত্র নির্মাণে বহুবিধ কৌশলে ব্যবহার করা হইত; উহার লৌহফলা সমূহ শাণযন্ত্রে স্থাপিত হইত উহা ক্ষারসলিল দ্বারা পীত; বহুবিধ ক্ষারসলিল উহাতে প্রয়োগ করা হইত; প্রাসনামক অস্ত্র ক্ষারসলিল (Varicus chemical unapurations or compounds) দ্বারা পীত বলিয়া জ্বলিত বা জলন্ত বা উহা নিষ্ক্রেপ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠিত।

দ্বিতীয়তঃ মহান্ সায়কের বিশেষণগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় তাঁহারা বিশেষ বিশেষ সূতীকবাণ প্রয়োগ করিতেন, তাহাতেও রসায়নের সংমিশ্রণ থাকিত; শাণযন্ত্রে স্থাপিত করিয়া ঐ ঋজুসায়কে সূতীক করা হইত; এইজন্য এই প্রকার (ক্ষারসলিল দ্বারা) পীত মহান্ সায়ক ও পরকায়াস্ত্র বর্ধ-পর্যন্ত ভেদ করিয়া যোদ্ধাকে বিদ্ধ করতঃ ভূতলশায়ী করিত।

তৃতীয়তঃ ঋড়গর বিশেষণগুলিও লক্ষ্যযোগ্য-তাঁহারা কিরূপ সুন্দর জব্য সমস্ত মনোনীত করিতেন, সূক্ষ্মশিল্পে কতদূর উন্নত ছিলেন তাহাও বুঝা যায় ; প্রাচীন রাজস্ববর্গের তীক্ষ্ণদার খজানমূহ এক আঘাতেই হস্তি-হস্ত বিদারণে সমর্থ হইত ; তাঁহাদের ঋড়গ সমূহের মুষ্টিস্থান হস্তিদন্তে বিনির্মিত, সুন্দর ও শুভ্র এবং চাকচিক্যশালী ; ঋড়গর আনক বা খাপ পবিজ্ঞ ও শোচনীয় ধীপিচর্ম্মকে (চিত্রব্যাত্রচর্ম্ম) বিনির্মিত, ইহাতেই বেশ বুঝা যায় ভারতীয় রাজস্ববর্গের রাজনীতিজ্ঞান ও কলাবিজ্ঞা উভয়ের অমুশীলন ও অভ্যাস তৎকালে পরিদৃষ্ট হইত, এবং দেশেও কলাবিদ ও শিল্পীর অভাব অপরিদৃষ্ট হইত ।

তাহাইলে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চমস্ত বৎসর পূর্বে অর্থাবর্তের অধিবাসি গণ যেরূপ জ্ঞানানুশীলনে পারদর্শী হইয়াছিলেন ও তাহারই চূড়ান্ত ফলস্বরূপ যেরূপ অক্ষনাঙ্কংকারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারা বিজ্ঞানের আলোকে আধিভৌতিকও আধিদৈবিক জগতের কল্যাণচর্চায় সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্তমানকালে বিজ্ঞানবলে যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হইয়াছে তাহা পুরাকালের জায় উপযোগী ও সম্পূর্ণ নহে : মহামতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্ বলেন যে তিনি মানুষ মারার পক্ষে নানারূপ কলকৌশল সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্কে বাপ্ত করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন, তিনি বলেন, সবম্যারিন্ প্রভৃতির পোতপ্রণাশে যে ক্ষমতা এখন দেখা যায় তাহা নিরর্থক করা যাইতে পারে ; জর্মানির প্রকাশিত মনুষ্যনাশক বিষময় (গ্যাস) বাষ্প অপেক্ষা ভয়ঙ্কর উপায় বা অস্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে ; তাঁহার বিজ্ঞানসাগরে শতকরা আশীজন জর্মানছাত্র শিক্ষা বা কাজ করিত ; তিনি (মহামতি এডিসন্) তাঁহাদের আচার ব্যবহারে তাঁহাদের প্রতি বড়ই অমুরক্ত ছিলেন, মহামতি এডিসন্ এই স্বদেশভক্ত যে তিনি আমেরিকান বলিয়া ও আমেরিকা যুদ্ধসম্বন্ধে নিরপেক্ষ বলিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই ; তিনি বলেন (Dove is my emblem) প্রেম, শীবে দয়া অমুরাগই আমার আদর্শ ; বর্তমান যুগে রসায়ন ও তড়িতশক্তি বলে কামান ও বন্দুক অপেক্ষা মনুষ্যনাশক নানাবিধ অস্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে ; একথা তিনি বলিয়া থাকেন এতৎসম্বন্ধে একটা ভ্রমলোকের সহিত এডিসনের কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

SCIENCE AND THE WAR.

Edison Reprses to invent means of increasing death roll,

THE TORPEDO.

The great mentor says a way will be found to offset it.

Henry A. Hall has an interesting intervend with Mr Thomas A. Edison, in "The world". The writer chatted with Edison, naturally enough, mainly on the war, and the views of the great inrenter on the part sivr is playing and will play in this great conpld make the think furionsly Here is the intervind :—

We began to talk about the war, and it was clear how duply Mr Edison was interst-ed. He told me that he had read every phicial document published in connection with the wents bading up to the outbreak of hostiteties.. The would not allow himself to be quoted on the subject, because to use his own words "This my duty as an American to be neutral," but it if was easy to see that he looks upon the struggle as something that goes for deeper than any merely cleavage, that it is a right to the death between democraey and anto cracy.

But Mr Edison was quite willing to talk about science as applied to warfare. The almost beredless appeal to his wonderful imugination and his bseadth of visien shewed in his answer to my first question. He said :—

"The dove is my unblem".

"Of course science can find much more affective ways of destroying life than by artillery and rile fire or the use it high enplosines. The possibilitis of chunistry and electricity have hardly haw touched upon in modern warifare, They can do a lot better.

"How" I as hed,

"I dont want to say. I went tell"

"Bat do you know of auy thing better ?

অর্থাৎ বহুকাল হইতে ভারতের রাজনীতি ও যুদ্ধ বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আসিতেছেন ; তাঁহারা বিমান, পুস্পক, ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শতদ্রো, বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা অনেকদিন হইতে অস্ত্রদেহে বিবিধ কারসলিল পান করাইয়া উহাকে মহাশক্তিশালী ও প্রভাবান্বিত

করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সে চেষ্টা তাঁহাদের কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে, অধুনা জার্মানি ও ইউনাইটেড্‌ স্টেটস্‌ অত্রকে এই কারসলিল প্রয়োগে সর্বাধিক সুপটু, মহামতি এডিসন্‌ বলিয়া থাকেন যদি পৃথিবী হইতে সমস্ত কয়লা ফুরিয়া যায় আমি এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহার ব্যবহারে পৃথিবীর সমস্ত লোকের কয়লার আবশ্যকতা মিটিয়া যাইবে ও তাহাতে পৃথিবীর অস্তিত্ব পর্য্যন্তের অভাব হইবে না, মার্কিনাধিনাসী সেই মহামতি এডিসন্‌ সাহেন বলেন আমেরিকা জার্মানির সহিত কখনই যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না, যদি আমেরিকা কখন কোন কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন আমি আমার দেশের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে এরূপ অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করিব, যাহাতে টরপেডো, সাবম্যারিনের প্রভাব বিলুপ্ত হইবে ও তাহাদের হাতে জাহাজের কোন ভয় থাকিবে না, ইহা আর কিছুই নহে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন্‌ এরূপ সমস্ত কারসলিল অবগত আছেন যে যাহা সুকৌশলে বিনির্মিত্ত বিবিধ অস্ত্রদেহে প্রযুক্ত হইলে উহা যুদ্ধভূমিতে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

ত্ৰীমতীশচন্দ্র দত্ত ।

সংবাদ ও মন্তব্য ।

ভূতশনে বসন । মহাত্মা গান্ধির অনুমতি হইয়াছে যে "নিরেশীয় বস্ত্র আশুনে পোড়াইতে হইবে। উহা অপবিত্র। অপবিত্র দ্রব্য দান করিলে গ্রহীতার অগমান করা হয়। উচ্ছিন্ন হস্ত প্রদান করিলে লোককে ঘৃণা করাই হয় উহা অকর্তব্য।" যুক্তির সাধুগণ স্বীকার করি, কিন্তু এই যে ধূল-নারী দুর্ভিক্ষ পীড়িত সহস্র সহস্র নরনারী বস্ত্র অভাবে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, ইতঃপূর্বে যে বস্ত্র অভাবে নারীর আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। তাহার কি প্রতীকার কেবল যুক্তিধারাবর্ষণে হইবে? অতঃপূর্বে, তোমরা বিলাতী বস্ত্র পোড়াইয়া অগ্নিক্রীড়া করিতেছ, আর প্রতিবেশী ভারতগিনীর বস্ত্রাতাবে উসঙ্গ! নিজেরা বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ কর। কিন্তু উহাদিগকে তোমাদের ত্যক্তবস্ত্র দান কর, উহাদের মান ও প্রাণ রক্ষা হইক। মহাত্মা গান্ধি কি জানেন না যে এদেশে শ্বব-শস্যারও গ্রাহক আছে। এখানে নিমন্ত্রণ

বাটা উচ্ছিন্ন প্রার্থীদের কাতর আবেদননিবেদনে মুখরিত হয়। এদেশের দৈন্যদারিত্য চিন্তা করিলে একগাছি তৃণও অনর্থক পাগুনে দিতে ইচ্ছা হয় না।

ভস্মভ্যাগ। প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি ভস্মভ্যাগ করিয়াছেন। ঘটনাটী যদিও এদেশে নহে, বিলাতে, তথাপি ইহাতে দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ যোগেন্দ্রনাথ এদেশেই কৃতী সম্ভান।

ডাকে বিমানের ব্যবহার। বিমানযোগে বিলাত হইতে ভারতে ডাক চলা-চলের ব্যবস্থা হইলে ভাল হয় কিনা—ইম্পিরিয়াল কন্ফারেন্সে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। অনেক অশুকুলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে হয় জলে স্থলে এতকাল চলিতেছে, এখন অস্ত্ররীক্ষে চলুক একটা যুগাপযোগী মূতন ব্যাপার হউক—অনেকে ভাবিতেছেন। আমরা কিন্তু ব্যয়ভ্রাস না হইলে ভুট্ট হইব না।

রুশিয়ায় দুর্ভিক্ষ। রুশিয়ার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। পেটের জ্বালায় লোকে পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতেছে—দাসকে আত্মসমর্পণ করিতেছে—দেশ ভ্যাগ করিতেছে—মৃত্যুর ক্রোড়ে চলিয়া পড়িতেছে। বলশেভিক্ গবর্নমেন্ট লোকের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। বলশেভিক্ গবর্নমেন্টের চেষ্ঠায় যে কার্য হইতেছে তাহা অভ্যস্ত অকিঞ্চিৎকর। অগ্ন্যদেশের লোকেরা যেরূপভাবে রুশিয়ার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নয়নাঙ্গীর প্রাণরক্ষণ করিতে অগ্রসর হইতে চাহেন, বলশেভিক্ গবর্নমেন্ট তাহাতেও সম্মত নহেন। এখন উপায় শ্রীভগবানের রাতা পায়। রুশিয়ায় এই দুর্ঘটনা পরীক্ষা না প্রায়শ্চিত্ত শ্রীভগবানই জানেন।

দণ্ডে হরতাল। খুলনাপ্রবাসী চন্দ্রপাছা ব্যবসায়ী নৌলবী শ্রীযুক্ত বসিরুদ্দিন সাহেব বশোহরে আসিয়া অসংঘত বক্তৃতা করায় ধৃত হন, বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দুইই হইয়াছে। এই উপলক্ষে বশোহরে ভীষণভাবে হর-তাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক রোগী ঔষধ পায় নাই। পথা পায় নাই। দোকানপাট বন্ধ। বাজার বসে নাই। আগম্বুক লোকেরা অনশনে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে দণ্ডিতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পায়, কিন্তু পক্ষান্তরে অনেকের প্রতি অশায় ব্যবহার করা হয় না কি? ইহাতে স্থানীয় জনগণের লাভ না ক্ষতি?

CO-OPERATION AND NON-CO-OPERATION. QUESTIONS & ANSWERS.

Parliament and India Office.

(a) The Control of Parliament and of the Secretary of State must only be modified as the responsibility of the Indian and the Provincial Governments to the electorates is increased. No power over provincial governments now exercised by Parliament and by the Secretary of State must be transferred to the Govt. of India save in matters of routine administration until the latter is responsible to the electorates.

(b) The Council of India should be abolished, and there shall be two permanent Under-secretaries to assist the Secretary of State for India one of whom shall be an Indian.

(c) All charges in respect to the India Office establishment shall be placed on the British Estimates.

(d) No financial or administrative powers in regard to reserved subjects should be transferred to the Provincial Governments until such time as they are made responsible regarding them to electorates, and until then the control of Parliament and the Secretary of State should continue.

(e) The committee to be appointed to examine and report on the present constitution of the Council of India shall contain an adequate Indian element.

(f) No dissolution of legislature shall take place except by way of an appeal to the electorate and the reason shall be stated in writing countersigned by the Ministers.

The Delhi Congress held in December 1916 passed the following resolution :—

"That this Congress also re-affirms Resolution No 5 relating to selfgovernment passed at the special session of the Congress held in Bombay subject to this that in view of the expression of opinion in the Country since the sitting of the said special session, this Congress is of opinion that so far as the Provinces are concerned full responsible government should be granted at once and that no part of

British India should be excluded from the benefit of the proposed Constitutional Reforms."

The Congress held in December, at Amritsar 1919 passed the following resolution :—

(a) That this Conference reiterates its declaration of last year that India is fit for full responsible government and repudiates all assumptions and assertions to the contrary wherever made.

(b) That this Conference adheres to the resolution passed at Delhi Congress regarding Constitutional reforms and is of opinion that the Reforms Act. is inadequate, unsatisfactory and disappointing.

(c) That this Congress further urges that Parliament should early take steps to establish full responsible government in India in accordance with the principle of self determination,

(d) Pending such introduction this Congress trusts that so far as may be possible, they so work the Reforms as to secure an early establishment of full Responsible Government, and this Congress offers thanks to the Right Honourable Mr. E. S. Montagu for his labours in Connection with the Reforms, It may be noted that Mahatma Gandhi himself took a prominent part in the proceedings, It should not be forgotten that this session was held more than 8 months after Punjab incidents had taken place, The omission of thanks to Lord Chelmsford was due to the Punjab incidents,

With the exception of a few leaders the moderates as a party did not join the Bombay, Delhi and Amritsar sessions. They had their separate Conferences. At the session held at Calcutta in December 1919 the latter passed the following resolution :—

Resolution. IV

While regretting the omission to introduce some measure of responsibility in the Central Government this Conference welcomes the Government of India Act. of 1919 as the first definite and substantial step towards the progressive realisation of responsible Government. This Conference appeals to all sections of the community, European and Indian, officials and non-officials, wholeheartedly to Co-operate for the successful working of the Act.

So you will see that both the parties agreed to work out the Reforms up to the end of the year 1919. Up to that time the difference was not very sharp. At first both agreed to have partial responsibility in the Provinces but wanted to have similar responsibility in the Central Governmet. The Extremists however later on, at Delhi, asked for full responsible govt. in the Provinces and partial

responsibility in the Central Government, And then at Amritsar they asked for full responsible Government but agreed to work out the Reforms as embodied in the Government of India Act, 1919 as a matter of Compromise. So up to December 1919, the Congress was for Co-operation. The release of Messrs Soukat ali & Mahomed-ali & their compact with Mahatma Gandhi may explain the change of front at Calcutta and Nagpur,

Q. The question of Non-Co-operation surely cannot rise if one believes in the sincerity of the British Govt. But when Mahatma Gandhi demands Swaraj or full responsible government immediately, does it not imply that he has lost all faith in the British government? And if he has lost all faith in the British Government, is he not justified to adopt Non-Co-operation as a means to the attainment of Swaraj within or without the British Empire by paralysing the government?

A. Even if he does not believe in the sincerity of the British Government, the question whether he is justified in adopting Non-Co-operation as a means to the attainment of Swaraj depends upon its practicality and efficiency.

Q. So far as I have been able to follow Mahatma Gandhi, his Non-Co-operation scheme includes : (1) renunciation of titles by titleholders ; (2) renunciation of all honorary offices ; (3) Boycott of government Councils (4) Boycott of educational Institutions directly, indirectly connected with Government. (5) Suspension of practice by lawyers ; (6) establishment of arbitration Courts ; (7) introduction of spinning wheels ; (8) non payment of taxes (9) Civil disobedience. The last two are to be resorted to if the other measures fail, Nonviolence is the essential adjunct of the whole programme. Do you consider these practical and efficient?

A. Let me take them up one after another.

1. Renunciation of titles :—

I do not know how renunciation of titles will paralyse the British Govt. The machinery of the government will go on as before even if all titleholders would give up their titles. Up to this moment only very few among titleholders have renounced their titles,

Q. Apart from the question of the practicality and efficiency of the renunciation of titles as a means to the attainment of Swaraj (a) Don't you think that titles demoralise both the giver and the recipient? (b) Is it not a fact that Govt. confers titles in expectation

of support of its unjust measures or as a reward for services rendered which are far from honourable ? (c) And don't you think that those who receive these titles put themselves under an obligation to support all govt. measures just or unjust ? (d) Is not the very system of giving titles pernicious ? (e) And are not titleholders as a rule altogether a bad lot ?

A (a) Yes they lead to demoralisation if they are conferred with some ulterior bad motive. But if they are conferred upon persons who have distinguished themselves in some or other walk of life, they may serve as incentives to others to emulate the examples of those who have been thus honoured. So far as I can see Mahatma Gandhi does not object to titles or distinctions in themselves but objects to receiving them at the hands of the British government which he considers Satanic or unholy. He himself was decorated with a Kaiser-i Hind gold medal on account of his services to the State in South Africa during the Boer War which he returned a few months before the Special Calcutta Session of the Congress in September 1920, I am not aware of his having objected to be called "mahatma" by the people ; perhaps he does not consider the source to be polluted. There are and there may be people who do their duty for the sake of duty alone and even such men will consider it discourteous or ungentlemanly on their part to refuse honours conferred upon them by the Sovereign and thus earn a cheap popularity with some people, if the Government for the time being is in bad odour with them. Some of them may decline such honours as being embarrassing or burden some and unsuited to the particular lines of life they may be following. There may be others who may do some deserving acts with a view to being honoured, though it is very difficult to prove men's minds and it is not unoften that we do injustice to others by attributing motives to them which may not really exist. Take for instance the case of a wealthy man who found a school or a dispensary or a dharmasala or constructs a road or digs a tank for public benefit, and the Sovereign honours him by conferring a title upon him. It may be that he had the idea of honour before his eyes or he had not, but the public are benefited all the same. In such cases, it is impossible for the Sovereign or his Representative to find out what his real motive was and nobody can blame him, if he recognises the charitable gift and honours the donor. In honouring deserving persons, the Sovereign represents the people and gives effect to their wish express or implied. There may be cases of honours

being misplaced intentionally or unintentionally but no human institution is perfect and even in free countries many instances may be found of honours having been conferred upon undeserving men. In democratic countries such as France or America, titles are not conferred upon any person howsoever high their position and howsoever distinguished their services to the State. But though titles are not conferred there are other methods for conferring honours. So titles cannot be said to be demoralising, if they are discriminately conferred.

(b) It is not a fact that Government confers titles in anticipation of services to be rendered. But it may be that they are occasionally conferred upon undeserving persons. But the recipients of such honours are immediately condemned by public opinion and honours in such cases prove more a source of torment than of pleasure to them. Titles in such cases are more or less brands of dishonour and are taken as such by the public. But counterfeit coins may sometimes pass as genuine ones. No human institution can be perfect.

(c) It all depends upon the recipient the Sovereign makes no condition. Honours once conferred are not taken away except in extreme cases where the recipients behave themselves in a manner utterly unworthy of themselves. Honours are not taken away even if the recipient opposes even good Government measures.

(d) The system of conferring titles can by no means be called pernicious. In this phenomenal world of ours there must always be distinctions. People always praise or blame good or bad qualities in their fellow beings. And the Sovereign in honouring deserving men only gives effect to the wishes of the people. The Sovereign may however, now and then abuse the privilege as I have already said. But such abuses gradually diminish with the growth of sound public opinion. You cannot condemn the system of the administration of justice. Even if in some cases the guilty are acquitted and the innocent punished.

(e) Take for instance the case of Bengal alone : If men like late Rajah (Dr,) Rajendralal, late Rai Kristodas Pal, Sir Romesh Mitter, Sir Chandramadhav Ghose, Sir Taraknath Palit, Sir Rashbihary Ghosh, Sir Gooroodas Banarjee, P. Iswar Ch. Vidyasagar C. I. E., Rai Dinabandhu Mitter, Rai Bankim Ch. Chatterjee C. I. E., Romesh Ch. Dalta C. I. E., Bhudev Mukherjee C. I. E., Rai Narendranath Sen, Sir P. C. Roy, Sir J. C. Bose, Sir Nilratan Sarkar, Sir D. P. Sarbadhicary, Sir Asutosh Mukherjee, Sir Asutosh Chawdhury, Maharaja Sir Manindra Ch. Nandy Bahadur, Raja Peary mo

Mukerjee,—not to mention other names—men who have distinguished themselves in different walks of life—are a bad lot, I do not know where you can find a better lot

Q. Will you please tell me why the late Mr. Gokhale declined to accept a knighthood? Was he not one of our greatest public men?

A. The late Mr Gokhale was a C. I. E. and that shows that he did not consider it wrong to accept an honour, I am sure he never thought of it but at the same time he did not consider it proper to throw it away when it was conferred. The Morly Minto Reform Scheme was considered unsatisfactory by the people. But as it was a distinct advance in the way of our political progress, he made up his mind to support it on the principle of "half-a-loaf is better than no bread" and so he thought that his acceptance of a knighthood might mar his usefulness with the public in successfully inducing them to accept what was given rather than to non-co-operate with it and make it a failure. He was in this frame of mind when he came somehow or other to know that a Knighthood was going to be conferred upon him and he prayed to the Govt. to be excused. It was an act of policy with an eye to the good of India's political progress.

Q. Are recipients of titles consulted before titles are conferred upon them?

A. No. So far as I know as a General rule they are not consulted. But there may be some exceptions to the General rule. The would-be recipients may however sometimes come to know of it; for the most secret news sometimes leak out of Govt. offices. I know many cases in which titleholders would have humbly begged the Govt. to excuse them, if they had known that they were going to be honoured. They however did not decline as they did not like to be discourteous.

Q. Do you approve of the conduct of Sir Surendra nath Banarjee in accepting a knighthood?

A. It is rather unsafe to pass opinion about public men who are still in the midst of their activities, but so far as Sir Surendranath is concerned the matter has been already discussed *ad nauseum* in the Press. I think I shall not be guilty of any impropriety in passing an opinion on it. Just at the present moment the Govt of India is in bad odour with the people on account of the injudicious if not perverse handling of the Punjab riots by the civil and military officers

concerned and a certain section of the politicians have spared no pains to discredit the Govt. as much as possible in the eyes of the people. Though Sir Surendranath had like other leading public men condemned the Punjab measures, he did not approve of the policy of Non-Co-operation and made up his mind to Co-operate with the Govt. in carrying out the Reforms recently introduced even at the risk of unpopularity. He had also agreed to accept a ministership. He had cut off his connections with the Congress which cast off old constitutional moorings. Naturally he became unpopular with a particular section of the public. Politics everywhere receive their local tinge due to personal jealousies and those that had no liking for and were jealous of him for his preeminent position in the political world of India, eagerly seized this opportunity for vilifying him to their hearts content. I do not think he has done anything wrong in not having declined the honour bestowed on him. Even if he had declined it, his enemies would have all the same kept up their chorus of abuse on the ground that by this act of apparent self abnegation he wanted to earn cheap popularity and restore to himself his previous position in the political world. If he was really consulted, it is doubtful whether he has acted wisely in not having declined it and followed the example of late Mr Gokhale in a similar situation ; though even then he was not likely to escape uncharitable remarks at the hands of his maligners. The honour done to him was an honour done to his public services as a journalist & politician I strongly disapprove of the uncharitable motives that have been attributed to him, and I am free to say this as I do not claim any personal friendship or political comradeship with him. Rai Bahadur Kristodas Pal C. I. E. who always used strongly to criticise the Govt. whenever it went wrong was honoured with a Rai Bahadurship and C. I. E. and by honouring him the Govt. also similarly honoured his public services as a journalist & politician.

Q. Have not Sir Rabindranath Tagore and Sir Subramania Iyer given up their titles ?

A Yes ; Sir Rabindranath Tagore has given up his knighthood but only as a protest against the oppressive acts of the civil and military officers in administering Martial Law in the Panj-b. But so far as I am aware men as eminent as he such as Sir Jagadis Bose. Sir P C Roy, who have distinguished themselves in the scientific world just as Rabindranath Tagore has done in the literary world did not renounce their titles. Rabindranath has not, so far as I know,

thrown himself on the side of Non-co-operation ; and if I remember aright, he was for having Mr. Montagu as our Viceroy. And Mr. Montagu has been strongly condemned by Non-co-operators for not having redressed the Punjab wrongs. This act of his clearly shows that he is not a Non-Co-operator.

Sir Subramania Iyer as you know wrote a strong letter to ex-President Wilson of U. S. A. depicting the evils of British administration rather in high colour. The occasion was the internment of Mrs. Annie Besant and two of her followers. When Mr. Montagu came here for preparing a scheme of Reforms along with Lord Chelmsford he took Sir S. Iyer severely to task for having written that letter to the President of a foreign State on the ground that the step was unconstitutional and that he had highly exaggerated the defects of the British Govt. and further that his object was to prejudice the American public against England who was then in need of American good will and help. That was the reason why Sir S. Iyer gave up his knighthood, Sir S. Iyer is not a non co-operator ; on the other hand, he has condemned the movement.

Q. What do you think of the renunciation of honorary offices ?

A. The honorary offices include such offices as Hony Magistrateship Hony. Munsif and Judgeship, Municipal Commissionership, Presidentship of Panchayets, membership of District Boards and Union Committees, Jurorship, assessorship etc.

Municipalities and District Boards have now been almost completely handed over to nonofficials and that is a step towards Swaraj. The Union Board as constituted in Bengal will now be able to decide even petty civil and criminal cases of the villages under them other provinces are going to have similar acts.

The jurors decide sessions cases and their verdict can be set aside by the High Court only on the ground of perversity. Very seldom do the High Courts interfere with the verdict of the jurors. The institution of jury is virtually an institution of judicial Swaraj. Assessors whose opinion is not binding are gradually being replaced by jurors everywhere. Hony. Magistrates if properly selected are by reason of their local knowledge can do better judicial work than the stipendiary officers. The Presidents of Panchayets also do valuable work in the villages.

(Continued.)

শ্রীহরি: ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন গতে রেজিস্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা ।

২৮ বর্ষ, ২৮শ খণ্ড
৬ম সংখ্যা ।

আশ্বিন ।

১৩২৮ সাল ।
১৮৪৩ শকাব্দা

পঞ্চমকার সাধন ।

সাপিছে সাধক মকার পঞ্চ স্থির করি শ্রাস্তমন ;
অঙ্গারক্রে ফরে সুধা পিয়ে ভোর সর্বক্ষণ ।
মা-হ'তে নির্গত বচন-অংশ ভোজন করিয়া পরে
মৌনরয় যোগী মাংসসাধনে ঈশ চরণ স্মরে ।
গঙ্গা-ঈ ডা পিঙ্গলা-ষমুনা বিচরে যে মীন ঐ নীরে
সযত্নে সেই মৌনরয়ে সাথে যোগী ধীরে ধীরে ।
শিরোপরি সহস্রদল স্থিত কর্ণিকার সনে
পারদ উজল মুদ্রা আত্মজ্ঞান লয় মনে ।
জীবাশ্বারে পরমাত্মায় মিলন করিয়া শেষে
পরমমৈথুনানন্দ যোগী ভুঞ্জে হেসে হেসে ।

শ্রীপশুপতি সরকার ।

লক্ষ্মীপূজা বা লক্ষ্মীলাভ

লক্ষ্মীপূজা! আমরা পার্থিব ধনসম্পদলাভের জন্য “লক্ষ্মীপূজা” করিয়া থাকি। আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস “লক্ষ্মীপূজা” করিয়া পার্থিব নৈবেদ্যাদি উপহার উপকরণবোধে পূজা করিয়া ‘মা লক্ষ্মীর’ প্রসন্নতাসাধন করিতে পারিলে আমাদের পার্থিবসৌভাগ্যোদয় হইবে। আমরা অধিকাংশই অশুশ্রুতবিশ্বাসে বিশ্বাস হইয়া জড়ের স্থায় পড়িয়া আছি, মৃত্তকাময়ী জড় অর্থাৎ ভাগস,—বিশ্বৃত্তিবশে বর্হিপূজা করিয়া অন্তীকলাভের বাঞ্ছা করিতেছি।

- প্রতিমায় ভাবপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান পূজা উপাসনা স্তবস্ততি দ্বারা সেইভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মোন্নতিলাভের জন্য সাধনা করাই যে প্রতিমাপূজা, অর্থাৎ বর্হিমুখীনপূজা করার উদ্দেশ্য, তাহা আমরা যেন বিশ্বাস হইয়াছি বলিয়াই সাধারণতঃ মনে হয়।

পার্থিব ঐশ্বর্য সম্পদলাভ করিতে হইলেও যে আপনার ‘স্ব’ কে অর্থাৎ Self কে অপার্থিব ঐশ্বর্যসম্পদে ভূষিত করিতে হয়। দৈন্য দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে যে “মনের” দৈন্যদারিদ্র্য ও লাঘবতা দূর করিয়া সম্ভাব সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় তাহা কেন আমরা বিশ্বাস হই ?

আমরা “কর্মবাদী, অদৃষ্টবাদী” আমরা “কর্মফল” মানি, মূঢ়ের স্থায় কাহার উপর অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া মাথায় হাত দিয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকি কেন ?

কর্ম ত আমারই, সং হউক অসং হউক জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আত্মকৃত কর্মেরই ত ফলভোগ করি। কর্মরূপ আমিই রোপন করি, কর্মফল আমিই প্রাপ্ত হই। বাসনামূরূপ কর্মের গতি প্রাপ্ত হই, কিন্তু সে বাসনাও ত আমারই বাসনা। আমি আমার বাসনার দ্বারা এবং বাসনামূরূপকর্মের দ্বারা কর্মগতি প্রাপ্ত হই। স্রোতের তৃণখণ্ডের স্থায় প্রবাহমুখে ভাসিয়া ভাসিয়া স্রোতজলের ঘূর্ণবর্তে পড়িয়া “তৃণখণ্ড” যেমন আবর্তমধ্যে ঘুরপাক খায় অথবা দৈবযোগে তীরেও উঠিয়া লুটাইয়া পড়িতে পারে। তদ্রূপ আমি আত্মবিশ্বৃত্তিবশতঃ কর্মপ্রবাহে কালস্রোতের আবর্তে পড়িয়া কেন ক্লিষ্ট পিষ্ট হই। সম্ভরণপট্টর - স্থায় আপনার গন্তব্যস্রোতামুখে বা স্রোতের প্রতিকূলে আত্মপরিচালনা করিয়াও কুল কিনারা পাওয়া যায় ?

আমরা দৈবনির্ভর করি। দৈব অনুকূল হইয়া আমরা আমার অভীষ্ট প্রদান করিবেন। যেন আমি কি আমার কেউ নই। আমার দেবতাকে আমার দেবাদিদেবকে, আমার আত্মচৈতন্য জীবচৈতন্যকে বিস্মৃত হইয়া (ঘরের ঠাকুর স্ব'আ) আমি কোন দেবতার প্রীতিও আশীর্বাদ আকর্ষণ করিবার আশা করিতে পারি? আমার ঘরের ঠাকুরকে তুচ্ছ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরের ঠাকুরের ভরসায় পড়িয়া থাকিয়া কিরূপে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিব বুঝিতে পারি না।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে "Heaven help their who help themselves" you তার মর্ম এই বুঝি, যে তোমার "স্ব" অর্থাৎ জীবাত্মাকে মুক্ত কর জীবাত্মার উদ্ধারের জন্য শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ লাভের জন্য তোমার আত্মাকে উপ-যুক্ত কর, ঈশ্বর তোমার সাহায্য করিবেন। অথবা মহাশক্তির সাহায্য লাভের জন্য আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ কর। আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য মহাশক্তির সাহায্য পাটবে। যেমন কম্পাসের কাঁটা চুম্বক গৌহের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তদ্বারা কম্পাসের দিগ্‌নির্গম হয়। কম্পাসের কাঁটা চৌম্বক-কর্ষণে একদিশুখী হইয়া থাকে। নাবিক তদনুসারে সকল দিকই নির্গম করিয়া লয়। তেমনি জীবাত্মাকে শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ লাভের জন্য একদিশুখী করিয়া পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মশক্তিলাভের জন্য "আত্মস্থ" অর্থাৎ আত্মা স্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া অভীষ্টলাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে।

পাৰ্থিব সম্পদলাভও অদৃষ্টই বাঞ্ছনীয়। পাৰ্থিবতা অর্থাৎ ইহ জগতের পুথসম্পদ ঐশ্বৰ্য্য লাভ ও ভোগ না করিয়া সাধারণতঃ জীবাত্মা পরমার্থিক মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিলে বিড়ম্বনা লাভ হয় ইহাই আমার বিশ্বাস।

কত কল্পকল্পান্তরের বাসনা প্রসক্ত; ভোগজন্যও জীবাত্মা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসক্তি ভোগবাসনার মুগ্ধ ও বিড়ম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সে সকল বাসনায় মুগ্ধ না হওয়া কথার কথা নয়। চপলচিত্ত বালক যেমন বালস্বভাবে যেটা সুন্দর সুন্দর দেখে তাহাই লইতে ইচ্ছা করে। কিছু কিছু বালকের বাসনা না বিগড়াইয়া কেবলই যদি শাসন তিরস্কার করা যায় অথবা যদি "ভাল নয়" "লইতে নাই" "খাইতে নাই" প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রবোধ দেওয়া যায় তাহাতে যেমন বালকের মন প্রবোধ মানে না, রোষতাজনাটরে বাসক কাণ্ড হইলেও মন মুগ্ধ হয়, ও কাম্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। বালকের

চাপল্য অপেক্ষাও চপল “মনকে” কেবল প্রবেশধারা ভোগবাসনায় নিবৃত্ত করা যায় না। বলপূর্বক মনোবিরোধ করিয়া প্রবৃত্তির নিবৃত্ততা লাভ সহজে হয় না।

পার্শ্ববাসনা প্রমত্ত মানব; পার্শ্ব কাম্যনাতে অসামর্থ্যপ্রাপ্ত ; অথবা অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় বিফলমনোরম হইয়া অনেক সময় ইংরাজী প্রবচনের জ্ঞানফললোলুপ শিয়ালের ন্যায় “Grapes are sure” বলিয়া সংসার-বিরক্ত হইয়া কেহ ২ বৈরাগ্য ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও ; এরূপভাবে ক্রয়বাদ বৈরাগ্যায়ীর প্রকৃতবৈরাগ্য লাভ হইয়া বাসনা সংযত অথবা বাসনামুক্ত হইয়া “নির্বাণ” লাভ হয় ? হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র গীতা, চণ্ডী, প্রভৃতি সকলশাস্ত্রই মোক্ষমার্গ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়, গীতার উপদেশ নিকামকর্ম, মানবকে অনাসক্তভাবে কর্মময়জীবনযাপন করিতে উপদেশ দিতেছেন। কর্মফল শ্রীভগবানকে অর্পণ করিয়া মানসস্থিত মানবের অন্তরস্থচৈতন্যকে শ্রীভগবানের নিয়োগ অশ্রুসারে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলিয়া মানবীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে সংসারভোগবাসনালোলুপ প্রমত্ত মানবের পক্ষে গীতাক্ত মানবজীবনযাত্রা সুনির্বাহ করা কি এত সহজ ?

তাহা নয় বলিয়াই পার্শ্বভোগবাসনাপ্রমত্ত সংসারপ্রবৃত্ত জীবাত্মা সাংসারিক ভোগবাসনা প্রাপ্তির জন্ত সাধনোপদেশ স্বরূপ “চণ্ডীতে” স্বর্গলাভ যে মানবের যাবতীয় ভোগবাসনা অর্থঃ মানব যাপি কিছু ভোগবাসনা চাহে, সেই সমস্ত ভোগপ্রাপ্তির জন্ত মহাশক্তি, ভোগ ও মোক্ষদাত্রী ভগবতীর নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম, সর্বসৌভাগ্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, কল্যাণ, বিপুলশ্রী, বল, বিদ্যা, যশঃ, লক্ষ্মীমান্ হইবার জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে, এমন কি ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিণীম্।” বলিয়াও প্রার্থনা করা হইয়াছে। রূপ, জয় ও যশঃ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভোগবাসনা প্রমত্ত সংসার প্রবৃত্তমানব, ভোগপ্রাপ্তির জন্ত কাম্যফল লাভের অভিলাষী হইয়া মহাশক্তির নিকট আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিয়া, কাম্যফল লাভের জন্ত সাধনায়, কাম্যফল শ্রেষ্ঠতরভাবে ভগবতীর প্রসাদ-স্বরূপে লাভ করিয়া, ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া, মোক্ষমার্গগামী হইবার জন্ত চণ্ডীতে ও অন্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থা লিখিত আছে।

“ন বাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাস্যতি” কাম কামনা উপভোগে শাস্ত হয় না। অর্থাৎ ঘৃতাভূতির ন্যায় আরও কামনার প্রজ্জ্বলিত হয় ইহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু ভোগস্পৃহার উদ্দামতা নিবারণ না করিলে, ভোগবাসনা সংযত করিবার জন্য “মন”কে লওয়াইয়া নিবৃত্তিমার্গাভিমুখীন না করিয়া কেবল উপভোগমাত্রদ্বারা নিবৃত্তির আশা করিলে উক্তরূপনিবৃত্তি অবশ্যই হয়। উপভোগের দ্বারা কামনা শাস্ত কদাচ হয় না।

কিন্তু আজসংযত করিয়া আত্মশক্তি উদ্ধৃৎকরতঃ সাধনরূপ মহাশক্তি ভগবতীর প্রসাদলব্ধ ভোগ অর্থাৎ চরিতার্থ করিয়া নিবৃত্তিমার্গাভিমুখী কাম্যাসুর নিবৃত্তির জন্য ঐকান্তিক লোভ হইয়া শুক্ৰচিত্তসাধক পারমার্থিক মুক্তিলাভ করিবার জন্যই তন্ত্রাদিশাস্ত্র সাধনোপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অবশ্য মুক্তিসাধনাও শাস্ত্রোক্ত যে উপায়ে লাভ হয়, যোরতরবন্ধন ও আবার সাধনপথেই লভা হয়। সুতরাং অধিকারিত্বদে বন্ধন ও মোক্ষ মানবের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং “স্ব” (Self) অধীনে মানসবৃত্তি স্থাপন করিয়া সাধন অর্থাৎ আত্মশক্তি উদ্ধার করিয়া “স্ব-স্ব” হইবার প্রয়োজন।

এইজন্যই “রূপং দেহি, জয়ং দেহি যশো দেহি” ইত্যাদি প্রার্থনা প্রতিপদে পদে করা হইয়াছে। আমার প্রকাম্য ভোগলাভ যেন শ্রেষ্ঠ হয়, যেন তাহাতে আমার নীচতাস্পর্শ না করে, ভোগের নিকট হইতে ভোগ সেরার জন্ম ভোগ প্রার্থনা না করিয়া, লোভের নিকট লোভ চরিতার্থতার জন্ম লুব্ধ প্রকাশ না করিয়া, কামের নিকট কাম প্রার্থনা না করিয়া অর্থাৎ এক কথায় লুব্ধবশতঃ ভোগাধীন না হইয়া, মহাদেবীর প্রসাদলব্ধ ভোগ, আত্মশক্তি জাগ্রতকরতঃ লাভ করিয়া, ভোগ, ভোগ করিবার জন্ম এবং ভোগাবসানে ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া ভোগ করিবার শক্তিতে, ভোগ করাই বাঞ্ছনীয়।

ভার্য্যা মহর্ষিনি, সুতরাং মায়ের নিকট (অর্থাৎ ভগবতীর নিকট) প্রার্থনা করা হইতেছে “ভার্য্যাক মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিনীম্।” আমার মনোবৃত্তির অনুসারিনী মনোরমা ভার্য্যা দেও মা। একরূপ প্রার্থনা করিতে হইলে এবং একরূপ প্রার্থনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, সাধককে তদুচিত উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে? সুতরাং সাধক মনোবৃত্তি জয় করিয়া, অর্থাৎ জীবাত্মা, মানসাধীন ভাবে, মনোবৃত্তি চালিত হইয়া না থাকিয়া জীবাত্মার

অধীনে মনোবৃত্তি চালিত করিয়া মানসবৃত্তি উন্নত অর্থাৎ শুদ্ধ করিয়া তবে মনোবৃত্ত্যানুসারিনী মনোরমা ভার্য্যাসক্ত করিতে হইবে।

আমার মনোবৃত্তি অর্থাৎ Association যেমন হইবে আমার সহগামী বা গামিনী হইবার জন্য তেমনি সকল আত্মাই ত আমার আশ্রয় অস্তরঙ্গ বন্ধু সহধর্ম্মিনী হইয়া আমার সঙ্গ করিবেন? এত সাধারণতঃ আমাদের নিত্য দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়। আমার প্রবৃত্তি অনুসারে আমার "সঙ্গ" লাভ হয়। যখন যেকোন আমার রক্তি, মতি, প্রবৃত্তি, তখন সেইরূপ সঙ্গলাভের বাসনা উদয় হয়, এবং রক্তি, মতি, প্রবৃত্তি অনুসারে আমার তক্রূপই সঙ্গ লাভ হয়। বহিঃজগতেও যেমন সর্বদা আনন্দলাভ করিতেছি, অন্তর্জগতের বিধানও তাহাই। আমি যদি নিকৃষ্টতম বাসনানুগত হই, আমার মনোরমা মনোবৃত্ত্যানুসারিনী ভার্য্যাসক্ত কিরূপ হইবে? আমার সহধর্ম্মিনীলাভ কিরূপ হইবে? সাধারণতঃ যাহা হয় তাহাই হইবে। অর্থাৎ নিকৃষ্টবাসনানুগতা হইবে।

আমাদের দেশে একটা ডাকের কথায় আছে "স্ত্রী ভাগ্যে ধন।" স্ত্রীকে লক্ষ্মীস্বরূপিনী বলা হইয়াছে।

আমার সংসার (World) আমিই যে রচনা করিতেছি। আমিই পুরুষ, আমিই স্ত্রী, আমিই পিতা আমিই পুত্র, আমিই ভ্রাতা আমিই ভগ্নী। আমি এক আমিই তধু। আমিই আমাকে বহুধা বিভক্ত করিতেছি। আমি স্বন্দ, আমি মিস্বন্দ, আমিই স্বন্দাভীত।

আমি জীবস্বরূপে পুরুষ, আমি মানস স্বরূপে প্রকৃতি। এই পুরুষ প্রকৃতি-রূপে আমার মধ্যে আমিই আমাকে বিস্তার করিয়া বাসনানুসারে সংসার রচনা করিতেছি। বাসনানুগত হইয়া জলবুদ্বুদের জায় আমি আমাকে অসংখ্যরূপে সৃষ্টি করিতেছি। আমিই আমাকে ভোগ, উপভোগ করিতেছি। কখন আমার মানস আমায় উপভোগ করিতেছে, কখনও আমি আমার প্রকৃতি-স্বরূপিনীমানসকে ভোগ করিতেছি। সেই জন্যই মনোবেগাধীনভোগকে সাক্ষ্য বলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় "ন যাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন নাম্যতি।" প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি মনেরই অবস্থা। মন জীবাঙ্কাকে ভোগ—সমস্ত করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত করায়। আমার জীবাঙ্কা মনকে সংযত করিয়া আপনার অধীন করিলে, মনোবৃত্তি জীবের অনুগত হইলে, জীব যাহা উপ-

ভোগ করেন, তাহা শ্রেষ্ঠভোগ এবং উহা ভোগে ও ত্যাগে জীবাশ্মার স্বাধীনতা থাকে ।

সুতরাং মন আশ্মার (জীবাশ্মার) সহধর্মী হইলে জীবাশ্মা শুদ্ধাশ্মার উন্নতমানসম্পন্ন হইবেই, সুতরাং মনোরমা মনোবৃত্তাসুসারিনী ভার্যাও হইবেই । সেই ভার্যাই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী “স্ত্রী” পরমাত্মী অর্থাৎ লক্ষ্মীর অংশু সমুদ্ভূতাও হইতেই হইবে ।

জীব মানবরূপে “মানসযোগে” অর্থাৎ বাসনাসুগত হইয়া জন্মায় এই জন্মই তৎ মানুষ । জীব, মনুষ্যরূপে পুরুষপ্রকৃতিভাবে মানবদেহে পুরুষপ্রকৃতিলালা করিয়া সংসারে আত্মবিস্তৃতি লাভ করিয়া, স্বজন্ম-পরিজন্মশক্রগিহনাশরূপে বিরাজ করিতেছে । জীব বীজস্বরূপে ; মানসক্ষেত্রে আত্মবিস্তারের জন্মই স্থলশরীরে মানবাদিজীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে । জীব—প্রাণী অজ্ঞানে পতিত হইয়া নানারূপ জীব-দেহে পশু প্রাণীরূপে জন্মলাভ করিতেছে । আবার পশুদি অপেক্ষা উন্নত-তর জ্ঞান ও মানসবল সম্পন্ন হইয়া মানুষরূপে জন্মলাভ করিতেছে ।

আবার জীব মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠতানিকৃষ্টতাভেদে দৈত্যদানব রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচ ও দেবাদিলীলা মানবদেহেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া করিতেছেন । এই মানুষেই দেবতা, এই মানুষেই দৈত্য দানব, রাক্ষস, প্রেত পিশাচের লীলাক্ষেত্র দেখা যায় । নরনারীরূপে জীব নানা লীলারঙ্গ করিতেছেন ।

শাস্ত্রেও দেখা যায় উপাসকের প্রকৃতি প্রবৃত্তির স্তরভেদে “লক্ষ্মীও” নানারূপিনী হইয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছেন । লক্ষ্মী, ধনদা, রতিপ্রিয়া, যক্ষী, পিশাচী, প্রভৃতি, পিশাচী সাধনেও ধনলাভ হয় ।

বিস্তৃত, প্রকৃত পক্ষে “স্ত্রী” লাভ করিতে হইলে, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন । উহাই প্রকৃত ‘স্ত্রী’ সম্পদলাভ । উহাতেই মানব শ্রীমান্ হয় । উহাই প্রকৃত সুখসম্পদ । আত্মপ্রকৃতি বশীভূত করিতে পারিলে অপূর্ণ স্ত্রী সম্পদে সৌভাগ্যবান্ হয় । আপনার মানস উন্নতিতে মানব ষথার্থই স্ত্রী সৌভাগ্যবান্ হয় । ভগবতী তাহার বাসনা ফলদাত্রী হন । সাধকের ভোগ-দাতৃরূপে সৌভাগ্যবিধায়িত্রী ইচ্ছাও হন । আবার তাহারই অংশ ভোগ্য-রূপে সহধর্মিনী ভার্যাও হন । এই জন্মই একই গুণশালিনী লক্ষ্মী অংশ-সমুদ্ভূতা রমণীকে লক্ষ্মীস্বরূপিনী ভার্যা বলে ।

(*) মানুষ man মূল্য Name মানসাধীম জীবাশ্মা ।

দেবকৃত লক্ষ্মীস্কোত্রো উল্লেখ আছে, “ক্ষমস্ব ভগবত্যস্ব ক্ষমাশীলে পরাংপরে। শুক্লদ্বন্দ্বরূপে চ কোপাদিপরিসর্জিতো।” ইত্যাদি ২ শ্লোক উক্তব্য।—রাজলক্ষ্মী রাজগৃহে গৃহলক্ষ্মী গৃহে গৃহ।”

গৌভাগ্য, মাহুষ পুরুষকারদ্বারা, অর্থাৎ আত্মস্থ (Self attainment) হইয়া লাভ করেন। সাধারণতঃ দেখা যায় পার্থিব সম্পদ ঐশ্বর্য বাঁহারা উপার্জন করেন তাঁহাদিগকে কৃতী স্বনামধন্য পুরুষ, এবং ইংরাজীতে Self made man বলে। সুতরাং Self অর্থাৎ “স্ব”কে Make অর্থাৎ স্বস্থ করিতে না পারিলে Self made হওয়া যায় না ?

আমারই মধ্যে ত্রি-শক্তি ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়াজ্ঞিকারূপে বিজ্ঞান আছে। উহাই মহাকালী মহালক্ষ্মী মঙ্গলরশ্মতী। উহাই বিদ্যা-গুণ-জ্ঞান মহাশক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা চৈতন্যরূপিনী মহামায়া, উহাই মানবের সাধনা, উহাতেই মানবের সিদ্ধি।

বিদ্যা জ্ঞান ও গুণইত মানবের ঐশ্বর্য অর্থাৎ accomplishment, সৎ-রজঃ তমোভেদে উক্তবিধ ত্রি-গুণাজ্ঞিকা মহাশক্তিমধ্যেইত মানব পার্থিব অপার্থিব ঐশ্বর্যলাভ করিতেছেন। উহারই অভাবদৌর্বল্যই ও অজ্ঞান জাড়া মূঢ়তা, দৈন্য দুর্দগা ক্লেশ। নিকৃষ্টতম বৃত্তির আশ্রয়েই ত মানব ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

ভাবেরই সব, ভগবতী-মহাশক্তি-মহামায়া ভাবাজ্ঞিকা, ভাবেরই মানব পশুত্ব লাভ করে, ভাবেরই মানব দেবত্বলাভ করে। সেইজন্যই বলে “বাদশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদশী।” কাম ক্রোধাদিরিণু নিচয়কে ইংরাজীতে Passion বলে। উহাই রিপুনিচয়কে, বিশেষতঃ কামরিপুকে পাশ্চাত্যভাষার ভাষায় Brutal Passion বলে। উহার বন্ধনবাদ “পশুবৃত্তি।” আৰ্য্যহিন্দুগণ রিপু-নিচয়কে পশুভাবে গ্রহণ করেন নাই। রিপুপ্রবৃত্তির পাশবিকতায় পশুবৃত্তি; মানবাত্মা নিতান্ত অধম রিপুপ্রমত্ত প্রমাদী না হইলে আর পশুত্ব প্রাপ্ত হয় না। আৰ্য্যগণ রিপুচয়কে দেবতা বলিয়াছেন বঃ দেখা যায়। কাম দেবতা, ক্রোধ দেবতা, সর্বল রিপুবই দেবতা আছেন। কামই অকাম, ক্রোধই অক্রোধ, লোভই অলোভ, ইত্যাদি। একেরই অবস্থাভেদে, বিদ্যা অবিদ্যা, অর্থাৎ জ্ঞান অজ্ঞানতাভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জীব রিপুর অধীন হইয়া রিপুসেবা করিবেনা, রিপু জীবাধীন হইয়া জীবের প্রয়োজনানুসারে সেবা করিবে। রাগেরই বিপরীত গতিকে মেঘ। সৎ জসত্তেরই একটা বিপরীত দিক।

এবং “সৎ” অসতেরই একটা বিপরীত দিক। পূর্বের বলিয়াছি রাগের অভাব প্রেম। প্রেমের অভাব রাগ। সতের অভাব অসৎ, অসতের অভাব সৎ। কামের অভাব অকাম, লোভের অভাব অলোভ ইত্যাদি। সুতরাং জীব শুদ্ধভাবে রিপুসেবিত হইলে “পাশবিকতা” বলা কেম সম্ভব হইবে। ভাষাগতভাবে আর্ঘ্য এবং পাশ্চাত্যপ্রকৃতিতে কতটা প্রকৃতিগত পার্থক্য দাঁড়াইয়া ছিল। যাহাতে রিপু সম্বন্ধে পরস্পরের ধারণা এতটা বিপরীত দাঁড়াইয়াছিল। Brutal passion, অর্থাৎ পাশবিকরিপুবৃত্তি বলিয়া ইংরাজীতে কথিত হইয়া থাকে। অতাস্ত রিপু অধীন হইয়া পড়িলে মানব, মানব-জন্মে ও নিকৃষ্টতমগতি প্রাপ্ত হয়। এমন কি মানব উহার অধীন হইয়া অত্যাশক্তি বশতঃ ভ্রষ্টজন্ম হইয়া মানবের নিকৃষ্টপ্রাণী, এমন কি জড়স্তরেও যাইতে পারে এইরূপ আমার বিশ্বাস। মানবজন্ম বহুযোনি ভ্রমণ করিয়া লাভ হয়, হিন্দুধারণানুসারে বিশ্বাস, চতুরশীতি অক্ষয়োনি ভ্রমণ করিয়া মানব-জন্ম লাভ হয়। Evolution অর্থাৎ ক্রমোন্নতিক্রমে যদি উত্থান হয়, তবে উত্থান থাকিলে পতনও তা আছে? ভাব (Sentiment) মনের ধর্ম। মন ভাবাধীনে উচ্চ বা অধমভালাভ করে, ভাব প্রকৃতি, ভাবাধীনে মনের অধীন হইয়া জীবাত্মা আত্মপ্রকৃতি লাভ করে। উহাই জীবাত্মার স্বভাব বা প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশিত হয়। উহাই আমাদের জন্মান্তরগতি লাভ করায়, সেইজন্য বলে “স্বভাব যায় না ধলে।” উহা হইতে কর্মফল অদৃষ্ট গঠন হয়। মরণেও স্ব-ভাব অর্থাৎ জীব, যেরূপ ভাবাধীনে চালিত হয় সেইভাবে নশ হয় না। কিন্তু স্ব-ভাব নশ হয় স্ব-ভাবের দ্বারা এই স্থানে উচ্চভাব ও অধমভাব বলিতেছি, অর্থাৎ “স্ব-ভাব যদি মন্দ হয় অর্থাৎ অসৎ স্বভাব নশ অর্থাৎ বিদূরিত করিতে হইলে সৎভাবগুলি গ্রহণ করিতে হয়। সৎ-ভাবে চিন্তা স্থিতি করিতে পারিলে “অসৎ” যাইয়া “সৎ” প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা লাভ করা অনায়াস সাধ্য নহে। সেই জন্যই সাধন সিদ্ধ ব্যাপার সাধনা করিয়া লাভ করিতে হয়। কায়মনোবাক্য বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা নিয়োজিত করিতে হয়। ইহা স্বায়ত্ত্ব অর্থাৎ স্বআয়ত্ত্ব ব্যাপার। বাহিরের দ্বারা সাহায্য লাভ হইতে পারে। সংগুরু, সংসঙ্গ, সদালাপ, সংচিন্তা, ইত্যাদি দ্বারা সাহায্যলাভ হইতে পারে, ইহাতে অশ্রুতা নাই। কিন্তু Retention Power আকর্ষণ বা গ্রাহীতাশক্তি তা ধারণা করা স্ব আয়ত্ত্ব ব্যাপার। সুতরাং “সৎ অসৎ” বাহা কিছু লাভ করি উহা আমিই করি, অসৎ

সৎও আছে অসৎও আছে, আমার অন্তরেও সৎ ও অসৎ উভয় প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু আমিই সৎ দ্বারা সৎ ও অসৎ দ্বারা অসৎ গ্রহণ করি।

সৎ ও অসৎই হচ্ছে "গুণ" সৎ অসৎভেদে সদগুণ অসদগুণ বলিয়া উল্লেখ হয়। সুতরাং গুণ ও প্রকৃতি। চলিত কথার আছে, "মনের গুণে ধম"। মনই গুণবোণে ধনী অধনী হয়।

লক্ষ্মী প্রকৃতি, সুতরাং মানবলক্ষ্মীলাভ করিতে হইলে মানসপ্রকৃতিতে সদগুণাধিত হইতে হইবে। সদগুণদ্বারা প্রকৃতি আয়ত্ত করিতে পারিলে লক্ষ্মীলাভ করা মানুষের স্বায়ত্তস্বাধী ব্যাপার।

সুতরাং সাধারণতঃ দেখা যায় পুরুষকারসম্পন্ন লোকেই জগতে অশ্র-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ঐশ্বর্যশালী হইয়াছেন। সুতরাং অশ্র অশ্রহিত ঐশ্বর্যলাভ করিয়া ঐশ্বর্যবাসনা না হইলে বাহিরের ঐশ্বর্যলাভ হয় না। এরূপ ব্যক্তিকে পার্থিব ঐশ্বর্যলাভ করিতে ব্যাকুল হইতে হয় না, ঐশ্বর্যের পাছে পাছে ছুটিতে হয় না। অদৃষ্টে অদৃষ্ট করিয়া কপাল ঠুকিয়া ফিরিতে হয় না। ভাগ্য ঐশ্বর্য উহাকে লাভ করিবার ক্ষমতা ছুটিয়া আমো। সামান্য আয়াসে বা অনায়াসে ঐশ্বর্যাধিত হন। কেন না তিনিই স্বয়ংই যে ঐশ্বর্য। তাঁহার গুণরূপ বিত্ত্বিই যে তাঁকে অপার্থিবমানে ধনী করিয়া রাখিয়াছে। পার্থিবতা তাঁর কাছে তুচ্ছ, সুতরাং তুচ্ছ বাহ্য শ্রেষ্ঠের নিকট তাকে স্বভাবতই অধীন।

এরূপ ঐশ্বর্যবান্ ব্যক্তিই ত প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ লক্ষ্মীমন্ত। ইঁহারাই ত সুখী। সদগুণশালী পুষ্প যেমন আগন সৌরভে আপনি আমোদিত, আপনার রূপে আপনি প্রমোদিত হইয়া আমোদ বিকিরণ করে তরুণ ইঁহারাও স্বয়ং-সিদ্ধ সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হইয়া অপরকেও সুখসৌভাগ্য বিতরণ করেন।

নিকৃষ্টতম বাসনাধীনে, নিকৃষ্ট উপায়, নিকৃষ্ট সাধনায়, কিকিৎ অর্থ সম্পত্তিলাভ বাহা হয়, তাহার দ্বারা কি মানুষ ধনী হয়? তাহাতে সুখও নাই শান্তিও নাই। উহা কাকালের পক্ষে বা তা খাইয়া কুখা মিটানবে। তাতেও কুখা মেটে না। সে কাকাল, চিরকাকালই থাকে। তার ইহকালও অষ্ট পরকালও অষ্ট, আমরা নাকি নিভাস্ত কাকাল, তাই আমরা যেন তেন প্রকারেণ কেহ কিকিৎ ধন বা বিষয় অর্জন করিলে তাহাকে ধনী, সুখী বড়লোক ইত্যাদি মনে করি। আমাদের শ্রেতশক্তিবশতঃ অজ্ঞানধারণাবশতঃ

এইরূপ ভ্রম জন্মায়। নচেৎ প্রকৃত উদ্যতে স্ত্রী নাই উহা সম্পদ নহে, উহা বিপদ, উহা ঘোরতর বিপদ। জীব আত্মায় ধন না হইলে কি মানুষ প্রকৃতপক্ষে ধনী হইতে পারে ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বলিদান-সমাধান ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

গুরু । দেখ বৎস, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দ এইস্থলে সাধারণ ব্রাহ্মণ অর্থে সর্ববিধ ব্রাহ্মণবোধক নহে। হীন বা গোণ ব্রাহ্মণকেই লক্ষ্য করিতেছে, বিশেষতঃ কত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে। এই ব্রাহ্মণের বিষয় পূর্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এইস্থলে সংক্ষেপে পুনরপি বলিতেছি।
অত্রি বলিয়াছেন—

অস্ত্রাহতাশ্চ ধনানঃ সংগ্রামে সর্বসম্মুখে ।

আরম্ভে নির্জিতা যেন স বিপ্রঃ কত্র উচ্যতে ॥

চৌরশ্চ উস্করশ্চৈতন সূচকো দংশকস্তথা ।

মৎস্তমাংসে সদা লুক্কো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥

ব্রাহ্মণের অসবর্ণগর্ভজাত পুত্রও ব্রাহ্মণশব্দে অভিহিত হইতেন। মহাভারত অনুশাসনপর্ব ৪৭ অধ্যায়ে যথা :—

কত্রিয়ায়াস্ত যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোহিপ্যসংশয়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাঙ্জাতো ব্রাহ্মণঃ শ্রামসংশয়ঃ ॥

কত্রিয়ায়াং তথৈব স্তাদ্ বৈশ্চায়ামপিটৈব হি ॥

বৈশ্বহিংসাদিকারী এই প্রকার গোণ বা হীন ব্রাহ্মণের ও মতাদিগণ বিধেয় নহে। ইহাই ঐ নিষেধবিধি হইতে কলবলে আসিতেছে। কারণ বাহার প্রাপ্তি নাই তাহার নিষেধ হইতে পারে না। ফলকথা কোনক্রমে বাহাদের ব্রাহ্মণসংজ্ঞা হইতে পারে তাহাদিগের ও মতাদির অধিকার নাই। ইহাই উক্ত নিষেধের সীমাসীমা বলিয়া জানিবে।

“বিপ্রতিষেধো যাদৃগ্জাতীয়শ্চ” যাদৃশ ব্রাহ্মণের বৈধহিংসা বিহিত হইতেছে তাদৃশ ব্রাহ্মণেরই উহার নিষিদ্ধ বৃত্তিতে হইবে। ইহা হইতে—

“বিধিরপি তাদৃগ্ জাতীয়শ্চ” এই শ্রায় অনুসারে মুখ্য ব্রাহ্মণের বৈধহিংসা-ধিকার স্থির হইতে পারে না, কারণ বৃহস্পতি তঁহাদের বৈধহিংসা করা কর্তব্য নহে বলিয়াছেন—

“বৈধহিংসা ন কর্তব্য। বৈধহিংসা চ রাজসী

ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্তব্য। ষতস্তে সাত্বিকা মতাঃ ॥

এইরূপ মুখ্য ব্রাহ্মণ যে সাত্বিক তাহাও বলা হইয়াছে, এবং এইরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে তারাপ্রদীপ ও যোগিনীতন্ত্র স্পষ্টরূপে বলি নির্দেশ করিয়াছেন যথা—

“পক্ষামৃতং তথা মৃতং শাল্যম্ পিষ্টকং তথা”—ইত্যাদি

এবং বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ শাল্যম্ বাথ পায়সম্”

ইত্যাদি আরও দেখ বংশ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভ্রয়ের শাস্ত্রবিহিত সাধারণ সংজ্ঞা “দ্বিজ” হইলেও সর্বত্র তাহার ব্যবস্থা স্বীকার করিলে “শূদ্রাণাং সুপকারী চ শূদ্রযাজীচ যো দ্বিজঃ। অসিজীবী মসিজীবী বিষহীনো যথোরগঃ” এইস্থলে অসিজীবী বলিয়া ক্ষত্রিয়েরও নিন্দা করিতে হয়। অজ্ঞজীবী হই যে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবধর্ম তাহা তোমাকে পূর্বে বলিলেও স্মরণ করাইয়া দিতেছি “ক্ষত্রিয়শ্চ নিত্যং জ্ঞাতা” “ক্ষত্রিয়োহি প্রজা রক্ষন্ শত্রুপাণিঃ” ইত্যাদি শূত্রাং অপরিভ্রাজ্য স্বভাবধর্মের নিন্দা করিতে হয়, তাহা কদাপি কর্তব্য নহে, কারণ “শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বসুষ্ঠিতাৎ” ইত্যাদি বহুস্থলে অনিষ্ট ঘটিয়া যায়।

অতএব পশুহিংসায় “বিপ্র বা ব্রাহ্মণ” শব্দে সর্ববিধ ব্রাহ্মণ কোনক্রমে সিদ্ধান্ত করা যায় না, এরূপ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণই বৈধহিংসাধিকারী জানিবে। তাহা না হইলে শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়। কোন বিধি বৃথা বিহিত হয় নাই। দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার করিলে কুত্রাপি বিরোধ হইতে পারে না, অস্ত্রপা মহানিষ্ট অনিবার্য।

শিষ্য। গুরো, বেশ বুঝিলাম এইস্থলে “বিপ্র বা ব্রাহ্মণ” উক্তবিধ গোণ বা হীনব্রাহ্মণ, অথবা নানাধিকার বিপত্তি। কিন্তু মাতৃকাত্তেদত্তস্তে ব্রহ্মমপটলে যে উক্ত আছে—

“পশুদানং বিনা দেবীং পূজয়েন্ন কদাচন”

পশুদান বিনা দেবীকে কখন পূজা করিবে না, তাহার কিরূপ মীমাংসা হইবে।

গুরু । বৎস, পশুদানের অধিকারিক্রিয়াদির পক্ষে বলি প্রশংসা-সূক্ষ বিধি বলা যায়। ইহা যে উক্ত অধিকারীর অবশ্য কর্তব্য নহে তাহা কতকটা সুরভরাজা ও সমাধিবৈশ্যের ভগবতীপূজা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাহারা বিনাপশুদানে দেবীকে সম্ভুষ্ট করিয়াছিলেন ত্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠে তাহা জানিতে পারিয়াছি। দেখ বৎস, পশুদানের অনধিকারী ব্রাহ্ম-ণের পক্ষে পশুর কল্যাণেরদ্বারা পূজাবিহিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার পশুদানের ফল হইবে, ইহা সাত্ত্বিকবলিপ্রকরণে বলিয়াছি। সুরভাং সকল অধিকারীর পক্ষেই প্রকারান্তরে এই ফলের স্বার্থকতা হইতেছে।

শিষ্য । গুরো, নিবন্ধে তৃতীয় পটলে উক্ত আছে—

“বলিদানং বিনা যন্তু পূজয়েত্তারিণীঃ নরঃ ।

ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্তাত্ত্বেষাং পশুধিয়াং প্রিয়ে ॥

বলিদান ভিন্ন যে ব্যক্তি দেবীপূজা করিলে, হে প্রিয়ে পশুবুদ্ধি তাহাদের জ্ঞান বা মোক্ষ কিছুই হয় না। ইহার কিরূপ মীমাংসা হইবে।

গুরু । বৎস, ইহা যথার্থকথা তাহাতে সন্দেহ নাই, বলিপ্রদান একান্ত কর্তব্য। ইহা দ্বারা পশুবলি যে সকলের অপরিহার্য তাহা কিরূপে বুঝা যাইতেছে। বলি যে সাত্ত্বিক ও রাজসিকভেদে ত্রিবিধ তাহার মধ্যে রাজসবলিই যে বলিশব্দ বাচ্য তাহার ত কোন নির্দেশ নাই, ইহা দ্বারা ত্রিবিধ বলিই বুঝা যাইতেছে এবং তাহাই অভিপ্রায় বলিয়া “বলিদান” শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, এখন অধিকারিভেদে বলিভেদ করিয়া এই উক্তির স্বার্থকতা বুঝিতে পারিলে কোন নিরোধ থাকিতে পারে না।

শিষ্য । গুরো পরাশর সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

“পশুযাগং প্রকুর্বাণঃ কলৌ বেদবিদাংবরঃ ।

পশুকৃতিং যবাত্মজ্যৈ কারয়িত্বা স্বমন্ত্রতঃ ॥

তত্র প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য ততমন্ত্রৈ বর্পাকরেৎ ।

ভেন বিষ্ণুঃ প্রশন্নঃসন্ দদাতীষ্টমনোরথান ॥

বেদবিদুপ্রধান কলিতে পশুযাগ অর্থাৎ পশুবলি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যৎস্বত প্রভৃতি দ্বারা পশুকৃতি নির্মাণ করিয়া বা করাইয়া সেই সেই মন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থাৎ যে পশুর যে মন্ত্র সেই পশুকৃতির

সেই মন্ত্রধারা ঐশ্বর্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছেদন করিবে, তাহাতে বিষ্ণু প্রীত হইয়া অতীত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এইস্থলে “বিষ্ণুই প্রীত হন বলা ইয়াছে অর্থাৎ বিষ্ণুপূজার এইরূপ বলি প্রদান করা কর্তব্য, শক্তি পূজায় নহে।

সুতরাং বৎস, এইস্থলে বিষ্ণু উপলক্ষ্যমাত্র উহা দেবীপূজায়ও বিহিত। কারণ দেখ বিষ্ণুপূজায় জীবহত্যারও বিধি রহিয়াছে যথা কালিকাপুরাণে ৬৭ অধ্যায়ে :—

রোহিতমশ্রু তু মংশ্রু মাংসৈর্বার্দ্ধিগমশ্রু চ।

তৃপ্তিং প্রাপ্নোতি বর্ধনাং শতানি ত্রীণি মংশ্রিয়া।

নীলগ্রীবো রক্তশীর্ষঃ কৃষ্ণপাদঃ সিতচ্ছদঃ।

বার্দ্ধীগমঃ স্তাৎ পক্ষী চ মম বিষ্ণোরপি প্রিয়ঃ ॥

করাহপুরাণে ১১৯ অধ্যায়ে যথা :—

মার্গং মাংসং তথা ছাগং শালং মাংসং তর্ধিবচ।

এতানি হি প্রিয়ানি স্তাঃ প্রযোজ্যানি বসুন্ধরে ॥

অথবা

মার্গং মাংসং বরং ছাগং শালং সমনুষুজ্ঞাতে।

এতানি প্রাপণে দত্তান্মম চৈতৎ প্রিয়াবহম্ ॥

পক্ষিণাক প্রাবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা বসুন্ধরে।

লাবকং কার্ত্তিককৈব প্রশস্তকং কপিঞ্জলম্ ॥

এতে চাত্ম চ বহবঃ শতশোহথঃ সহস্রশঃ।

মম কৰ্ম্মণি যোগ্যা যে তে ময়া পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

যোগিনী স্তম্ভে :—

মার্গং মাংসং তথা ছাগং শালং শালকস্তথা।

এতৈস্ত্ব প্রাপণে দত্তাঘিষ্ণোশ্চৈব প্রিয়াবহম্ ॥

রোহিতমশ্রু ও বার্দ্ধিগমমাংসধারা আমার প্রিয়া তিনশতবর্ষ তৃপ্তি লাভ করেন। নীলগ্রীবা, রক্তবর্ণমস্তক, কৃষ্ণবর্ণপদ ও শ্বেতপক্ষপক্ষীকে বার্দ্ধিগম কহে, তাহা আমার এবং বিষ্ণুরও প্রিয়। মৃগ-ছাগ-শালকমাংস হে বসুন্ধরে আমার প্রিয়। পক্ষিগণের মধ্যে বাহার। আমার বলিরূপে বধা হইতে পারে তাহা বলিতেছি, লাবক অর্থাৎ লাভা বা লাওয়া পক্ষী, কার্ত্তিক-পক্ষী প্রশস্ত, কপিঞ্জল অর্থাৎ চাতক বা তিতির এবং অন্যান্য শস্ত

শত শত সহস্র সহস্র পক্ষী আমার কর্ম অর্থাৎ পূজার বাহারা প্রযুক্ত হইতে
পাবে তাহা বলিয়াছি, ইত্যাদি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে বিষ্ণুর
জীববলি শাস্ত্রবিহিত, সুতরাং এই পরাশরসংহিতোক্তবচনদ্বারা বিষ্ণু উপ-
লক্ষিত হইতেছেন মাত্র বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুর পক্ষে সাধিকবলি মীমাংসা
করিলে উক্ত শাস্ত্রসমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে। আরও বৎস, শক্তিপূজার
সাধারণফল বিষ্ণুশ্রীতি ব্রহ্মদামলে আত্মাস্তোত্রে উক্ত আছে :—

“বিষ্ণুশ্রীতিপ্রদা দুর্গা স্বধনা যোক্ষমা সদা”

অতএব বিষ্ণুর বাহাতে শ্রীতি দেবীর তাহাতে শ্রীতি না হইবে কেন ?
এই সংহিতাবচন কেবল বিষ্ণুবিষয়ক বলিতে পার না, অতএব শক্তিপূজার
ও ঐরূপ বলি অবশ্য স্বীকার্য। এই নিমিত্তই ভরাদ্বয়দীপতীতীয়পটলে
উক্ত আছে।

সাধনো জীবহত্যাকি কদাচিত্তৈব কারয়েৎ।

ইক্ষুদগুর্ক কুশাণ্ডং তথা রম্যকলানিচ

পিণ্ডকৌটৈঃ শালিচূর্নৈঃ পশুং কুশা দদেবলিম্

তৎকালবিশেষে সংপশুং করয়েৎ সদা

সুতরাং অধিকারিভেদ স্বীকার না করিলে আর উপায়ান্তর নাই।
ভগবতাক্য ভাষা হইলে বিফল হইয়া যায়। ইহাও আবার সর্ববর্ণের জন্য
একান্ত বিচিত্র এই সিদ্ধান্ত করিলে “পশুহিংসা” বাধিত হইয়া পড়ে ; অতএব
সাধকভেদ অনিবার্য। এইহেতু পরাশরের এই বচন কেবল বিষ্ণুবিষয়ক
মীমাংসা করা যায় না। যদি সাধিকবলিই মাত্র বিষ্ণুর বিষয় হইত, তাহা হইলে
এই বচনের বিষ্ণুবিষয়ে বিশেষ সার্থক্য থাকিত, কিন্তু তাহাত নহে দেখিতে
পাইলে, অতএব এই স্থলে বিষ্ণু উপলক্ষ্য মাত্র।

শিষ্য। সুতো, এই সংহিতোক্ত বিষ্ণু যে উপলক্ষ্যমাত্র, তাহা এখন
বুঝিতে পারিলাম, আমার ধারণা ছিল বিষ্ণুবিষয়ে বলিমাত্রই নিরামিষ
এখন সে ধারণা দূর হইল। দেখিতেছি সর্বদেবদেবীরই ত্রিবিধপূজা
বিহিত। সুতো, উক্ত বচনে “কারয়েৎ” এই নিম্নস্ত জিহ্বাপদের “সাধক”
প্রয়োজককর্তা বলিয়া স্বয়ং জীবহত্যা যে করিবেন না তাহাও ভাল বুঝিতেছি
না। তিনি জীবহত্যা করাইবেন না—ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাহা
হইলে সাধকের মুখ্যরূপে বর্জ্য এই বচন হইতে বিরূপে গৃহ্য হইতে
পারে ?

গুরু। বৎস, ইহা অতি সামান্য কথা, মাত্র ব্যাকরণসাহায্যেও ইহার মুখ্যকর্তৃক প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যেমন “কংসবধমাচষ্টে” এই বাক্যে কংসঘাতয়তি এই মুখ্য কর্তৃগামিণিজস্ক্রিয়া “ঘাতয়তি” হইয়াছে সেইরূপ “কৃদন্তোপাখ্যানে কল্পুঃ, প্রকৃতিপ্রত্যাপত্তিঃ, প্রকৃতিবচ কারকম্” এই সূত্রানুসারে জীবহত্যা করণমাচষ্টে এই বাক্যে “জীবহত্যাং কারয়তি এইরূপে গিঞ্জস্ক্র কৃধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে। সাধকের মুখ্যভাবে স্বয়ং কর্তৃক স্বীকার না করিলে এইস্থলে “কুয়া ও দদেৎ” এই দুই আখ্যাত ও অনাখ্যাতক্রিয়ার কর্তা “সাধক” হইতে পারে না। সাধক “প্রয়োজককর্তা হইলে “কারয়িত্বা ও দাপয়েৎ” এইরূপে ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইত, তাহা ও হয় নাই, সুতরাং এইস্থলে সাধক প্রয়োজক কর্তা নহে। মুখ্যভাবে সাধকের কর্তৃক স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রীয় বচনান্তর দ্বারা ইহার স্বয়ং কর্তৃক মীমাংসিত হইতেছে। বৃহন্ন্যাসু বলিয়াছেন।

“হিংসারিচৈব ন কর্তব্যং বৈধহিংসা চ রাজসী।

ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্তব্যং যত স্তে সাধিকা মতাঃ।”

এই উক্তিও “বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ শাল্যায়ং বাথ পায়সঃ ইত্যাদি “পক্ষা-মৃতং তথা খণ্ডমিথাদি প্রমাণবচনসম্প্রদায় হইতে অনায়াসে স্বয়ং কর্তৃক মীমাংসা হইতেছে সুতরাং কারয়েৎ” এই ক্রিয়ার আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

তৃতীয়তঃ অনধিকারীকে ও সাধক এই জীবহত্যা করাইবেন না তাহাও বুঝাইতেছে। এখন বুঝিলে বৎস, শাস্ত্র কেমন সুন্দর নির্বিবোধ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শিষ্য। হাঁ গুরো, এখন বুঝিলাম কেন সাধক আপনি জীবহত্যা করিবেন না বা করাইবেন না বলিয়াছেন। গুরো, গঙ্কর্বতন্ত্রে চতুস্ত্রিংশ পটলে—

“ন শস্ত্রং মারণং কৰ্ম্ম ব্রহ্মাপ্তৌ ব্রহ্মসাধক।

সদা সৰ্বানি ভূতানি স্বাত্মৈব পরিপশ্যতি।

সৰ্বিভূতমিবাগ্নানং ব্রহ্মসম্পত্তে তদা ॥

বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম (মুক্তি) প্রাপ্তি বাঁহাদের হইয়াছে, সৈদৃশ ব্রহ্মসাধকের (ব্রহ্মনিষ্ঠের মুক্তের) মারণকর্ম্ম অর্থাৎ হিংসা প্রশস্ত নহে। যিনি সমস্ত ভূতে ও সমস্ত ভূত বাঁহাতে, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠেরই মারণকর্ম্ম উচিত নহে। অগ্নের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে ভাষাতে অধিকার নাই তাহা ইহাতেও বুঝাইতেছে না।

শুরু । বৎস, ব্রহ্মনিষ্ঠের শ্রোতস্মার্ত্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য প্রভৃতি কোন কর্মের কর্তব্যতা নাই, তাঁহার বলিশূণ্য বা হিংস'শূণ্য কর্মের অধিকার কিরূপে থাকিতে পারে? যেমন বহ্যার পুত্র, গগনের কুসুম, শশকের বিষণ, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠের বা মুক্তের বা সর্বভূতাত্মসমদর্শীর মারণাতিরিক্ত কর্ম। সুতরাং "ন শস্তং মারণং কর্ম ইত্যাদি" এই শ্লোকে সাধারণ সাধিকের কর্তব্যনির্ণায়ক এবং "যদাসর্বানি ভূতানি" ইত্যাদি ঐ সাধিকের স্মৃতিপত্র। ইহার প্রকৃত জ্ঞানকাণ্ডান্তর্গত অভিপ্রায় সর্বকর্মভ্যাগী মুক্ত পুরুষ। ইহা কর্মাদিকারী মুমুকু সাধিক-সাধকের প্রতি বিহিত বুদ্ধিতে হইবে, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণকে বুঝা যাইতেছে।

শিষ্য । শুরো, ইহা ঠিক বুদ্ধিতে পারিলাম না, কিরূপে আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠের বা মুক্তের কর্মাদিকার নাই বলিতেছেন। নিকাম যাগাদিকর্মাদিকার তাঁহাদের অপরিভ্যাজ্য, ইহা শ্রীভগবান্ গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

“যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম ন ভ্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

এতাশ্চপিতু কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যজ্জা ফলানিচ ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥

নিবন্ধে ত্রিসপ্তত্বিতম পটালে যথা :—

“জ্ঞানিনোহজ্ঞানিনো বাপি যাবদেহশ্চ ধারণম্ ।

ভাবধর্নাশ্রমাচারঃ, কর্তব্যঃ কর্ম্মমুক্তয়ে ॥

যজ্ঞ দান ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিভ্যাজ্য নহে, কর্তব্য, কারণ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনীষিগণের অর্থাৎ ফলকামনাবিরহিত সাধকগণের পাবন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি-হেতু। এই যজ্ঞ দান ও তপস্যা, হে পার্থ! আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিভ্যাগ-পূর্বক মুমুকু কর্তব্য—ইহা আমার উত্তম ও নিশ্চিত মত। অর্থাৎ মুমুকু জ্ঞানী বা অজ্ঞানীই হউক কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভের জন্য বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম যতক্ষণ দেহধারণ ততক্ষণ করিতে হইবে। সুতরাং শুরো, ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ম্মাদিকার যে নাই তাহা ঠিক বুদ্ধিতেছি না।

শুরু । বৎস, তোমার এই আশঙ্কা ঠিক বটে, কিন্তু দেখিতেছ কি, কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভের জন্যই কর্ম্ম বিহিত; তাহাতে মুমুকুর কর্ম্মাদিকার বলা হইয়াছে, মুক্তের নহে, মুমুকু ও মুক্ত এক নহে। এতদ্ব্যতীয়ে অনেক প্রভেদ। কর্ম্মবন্ধন হইতে যে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত সেই মুক্তপুরুষ, যে ঐ বন্ধন

হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছে কিন্তু মুক্ত হয় নাই সেই মুমুকু। এই মুমুকুদিগের নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি নিহিত, মুক্তের জন্ম নহে, মুক্তের কর্মাদিকার নাই। তাহা বেদান্তসারে বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

“অধিকারী তু বিধিবদধীত-বেদ-বেদাজ্জেনাপাততোহধিগতাখিলবেদার্থো-
হস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তয়ে বা কাম্যানিষিক-বর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়-
শ্চিত্তোপাসনামুষ্ঠানেন নিগতনিখিলকল্মষতয়া নিভাস্তনির্মলস্বাস্তঃ সাধন-
চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা। যথাবিধি বেদ বেদাজ্জ অধ্যয়ন করিয়া আপাতত
অখিল বেদার্থ অবগত; এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য-নিষিক কর্ম বর্জন-
পূর্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা নিখিল-পাপ-বিহীন
হওয়ার নিভাস্ত নির্মলস্বাস্তঃকরণ এবং নিত্যামিত্যবস্তুরবিবেকাদি সাধন-
চতুষ্টয়সম্পন্ন পুরুষই মোক্ষাধিকারী। এই হেতু “যদা সর্বানি ভূতানি”
ইত্যাদি বচন দ্বারা কর্মাদিকারী সাত্ত্বিক সাধকের স্তুতি মাত্র বুক্তিতে হইবে।
উহা যে যথাশাস্ত্র ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির পক্ষ নহে, তাহা এই মোক্ষাধিকারী হইতেই
বুঝা যাইতেছে। ঐরূপ বিধিনিষেধ মুমুকুর নিমিত্ত বিজিত, মুক্তের জন্ম
নহে, এই মুক্তপুরুষ কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ উদাসীন। বহির্মার্গাদি কর্মে তাহার
অধিকার নাই, তিনি ত্রিগুণাতীত আকাশবৎ সর্বব্যাপী; তাহার উপাস্ত ও
উপাসনা নাই, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। শ্রীগবান্ গুণাতীতের লক্ষণ
গলিয়াছেন :—

“সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রীশাকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তস্তনিন্দাত্মদংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রাদ্রিপক্ষয়োঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিভ্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥

যাঁহার দুঃখ ও সুখ সমান, যিনি সম প্রিয়, যাঁহার নিকট লোষ্ট্র কাঞ্চন
সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার তুল্য, যিনি ধীর ও যাঁহার নিন্দা ও প্রশংসা
তুল্য, যাঁহার মান ও অপমানে সমান স্তান, যিনি শত্রুগিত্রে সমজ্ঞান করেন
এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম পরিভ্যাগ করিয়াছেন-তিনি গুণা-
তীত হইয়াছেন। ভগবান্ আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে সর্ব্বারম্ভপরিভ্যাগীর এই
রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—সর্ব্বারম্ভপরিভ্যাগী দেহধারণমাত্রনিমিত্ত-ব্যতি-

রেক্ষণ সর্বকর্ষপরিভ্যাগীত্যাগীত্যর্থঃ ॥—দেহধারণমাত্র প্রযোজনভিন্ন সর্ব-
বিধ কর্ষত্যাগী ।

আরও নৈকর্ষ্যাসিদ্ধি ৪।৬ উক্ত আছে :—

“উৎপন্নাত্মাববোধস্ত হৃদেষ্কৃৎসাদয়ো গুণাঃ ।

অযত্নতোত্তবস্ত্য ন তু সাধনরূপিণঃ ॥

যাঁহার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার ঘেষশূণ্যতাগুণ সমূহ বিনা যত্নে
সমুৎপন্ন হয়, তাহার তাঁহার সাধনস্বরূপ নহে ।

সর্ববেদবেদান্তসিদ্ধান্ত বেদান্তসারে উক্ত আছে—

কিং বহুনা দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাপ্রাপিতানি সুখদুঃখ-লক্ষণাণা-
রূক্ষফলাশ্রুতবসন্তঃকরণাতাসাদীনামবভাসকঃ সংস্কারবসানে প্রত্যগানন্দপরব্রহ্মনি
প্রাণে জীনে সত্যজ্ঞানতৎকার্যসংস্কারাণামপি বিনাশাৎ পরমকৈবল্যগানন্দৈক-
রসমখিলভেদপ্রতিভাসরহিতমখণ্ডং ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে ॥ ৫৮ ॥ বিশেষ আর কি বলিব,
দেহ-যাত্রামাত্র-নির্বাহ-নিমিত্ত স্বেচ্ছাকৃত ভিক্ষাটনাদি, পরেচ্ছাকৃত অর্থাৎ
সমাধিব্যবস্থাতে শিষ্টাদি প্রদত্ত অন্নাদি এবং অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় বা
বুখানদশায় আকাশ হইতে পতনতুল্য অকস্মাৎজাতপাষণ-পতন কণ্টকবৈধাদি
ত্রিবিধ প্রারক্ণমাত্র-জনিত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির সাক্ষিক্রমে
সর্বপ্রকাশক হইয়া ভোগদ্বারা সেই প্রারক্ণ-কর্ষ্যকর হইলে অভিন্নানন্দ
পরব্রহ্মে প্রাণ জীন হয়, তাহাতে অজ্ঞান ও তাহার কার্য সংস্কারাদির বিনাশ-
বশতঃ পরমকৈবল্য, আনন্দৈকরস, অখিলভেদবুদ্ধিবিরহিত, অখণ্ড ব্রহ্ম-
স্বরূপ অবস্থিত হন ।

আরও নৈকর্ষ্যাসিদ্ধিতে প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে :—

অধর্ম্যাজ্জায়তেহজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ ।

ধর্ম্যকার্যে কথং তৎ স্মাদ্ যত্র ধর্মো বিনশ্চতি ॥

অধর্ম হইতে অজ্ঞান এবং তাহা হইতে যথেষ্টাচরণ । বেষ্টানে অর্থাৎ
যুক্তপুরুষে ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে (যাঁহার ঋতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম-
কার্যের কর্তব্যতা নাই) তাঁহার ধর্ম্যকার্যে যথেষ্টাচরণ কিরূপে সম্ভব
হইতে পারে—অর্থাৎ যুক্ত পুরুষ কখন যথেষ্টাচার করিতে পারেন না ।

মহাত্মারতেও ধর্মত্যাগের উল্লেখ আছে :—

নিরাশিবমনারম্ভং নিরাকারমস্ততম্ ।

অকীর্ণং কীর্ণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

যাঁহাকে আশীর্বাদ করা যায় না, যাঁহার নমস্চ নাহি, যাঁহার কর্ম্মারম্ভ নাহি, যিনি অস্তুত, যিনি অক্ষীণ এবং যাঁহার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া থাকেন।

আরও বৃহদারণ্যব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন “অমৌনং মৌনং চ নির্বিচ্ছাদ ব্রাহ্মণঃ।” ব্রহ্মকে মনন ভিন্ন কোনরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না, মনন দ্বারা অনুসন্ধান করা যায়, ইহা নিঃশেষরূপে জ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মনিষ্ঠ কৃতকৃতার্থ হন।

যোগিনীতন্ত্রে :—

সর্ববিং ব্রহ্মময়ং পশ্চৈজ্জগদেতচ্চরাচরং।

আত্মদেহাধিকং কিকিঞ্জানাতি নচ কধিচিৎ ॥

ভেনৈব ব্রহ্মজ্ঞানেন দেহকর্ম্মাদিকং খলু।

ভস্মীভূতং মহেশানি ঋষেষুশ্চ মহাত্মনঃ ॥

অনন্তর তিনি এই অখিল চরাচর ব্রহ্মময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি দেহাদি কিছুই কখনও জানিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সেই মহাত্মা ঋষির দেহকর্ম্মাদি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল।

বশিষ্ঠ বলেন—“ন কর্ম্মানি তাজেদ্যোগী কর্ম্মতিস্তুজ্যতে হ্রসৌ” যোগী কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, কর্ম্ম তাঁহাকে ত্যাগ করে।

নৈকর্মাণিকি ৪। ৬২—যো হি যত্র বিরক্তঃ স্তামাসৌ ভস্মিন্ প্রবর্ত্ততে।
লোকত্রয়াধিরক্তদান্ মুমুকুঃ কিমিতীহতে ॥—

যে যাহাতে বিরক্ত, সে তাহাতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। লোকত্রয়ে বিরক্ততানিবন্ধন মুমুকু কি চেষ্টা করিবেন? বেদান্তসারে বিদ্বান্নোরঞ্জিনী বলেন—ঔদাসীণ্যমেব মুক্তলক্ষণং ন বিধিপরতন্ত্রপ্রবৃত্তিমত্বং ন বা নিষেধাতি-
ক্রম ইতি ॥—সর্বকর্মে ঔদাসীণ্যই মুক্তলক্ষণ, কোন বিধি-প্রতিপালন-প্রবৃত্তি বা নিষেধের অতিক্রম তাঁহার দ্বারা হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলরাম বিহারত্ন সাংখ্যভূষণ।

आगमनी ।

(१)

विकाशिहीरकच्छ विप्रकाशितारहारकः
सितांशुभातिवज्रको लसत् सिताब्जसुकः ।
अतुर्हि शारदो वनमनेन उर्गोरथो यथा
विषोषयत्ताहोजने जगत्प्रसूसगागमम् ॥

(२)

घनाशुपातनच्छले मुदश्रुतिर्गुताङ्गका
विकाशिकाशमुदरप्रथोतशुभ्रवज्रका ।
यरोज्जराजिवाजिता विहङ्गकृजनच्छगात्
अगाय मातृमन्त्रः समाह्वयेत् शब्दं नू ताम् ॥

(३)

शिवागमेहृषिक्रमो गृहीतपुष्पशाधकः
हिमाश्रुपातनैरदो निषेदितस्त्रविग्रहः ।
समर्चयेत् असूपदः पतद्विकृजनच्छलेः
निवेदयेत् मनोवाथाः, तथापि किं जडः स हि ॥

(४)

अनसुमातृभक्तिभोद्रवीकृतानुविग्रहा
जलाशया निमील्य किं विकाशिपद्मनेज्जकम् ।
हिमाश्रुतिर्विराजितः निलीनभृशतारकः
अमृतसारसम्भैः सुवसिताः त्रिग्राहाम् ॥

(५)

विमोकेयेदहो नकिं ? अङ्गोऽपितालवृक्षकः
अमापहर्तुमानसो गृहीततालवृक्षकः ।
शिवकरीसमागमे सुवीजयत्तावर्निशः ।
नहीन्निशुक्ता वुःध कदापिञ्जेहृवसीमति ।

(৬)

স্বভূমিহুঃখতো দ্রবস্বরূপিণী ভরঙ্গিণী
কলধনির্জ্জগজ্জনে নিবেद्य দুঃখকাহিনীম্ ।
পুগায় মাতৃগীতকং ভবচ্ছিদং প্রমোদিতা
প্রয়াতি ভর্জসঙ্গমে ভবৈকতারণে ন কিম্ ?

(৭)

ত্রিতাপদুঃখনাশিনি ! হিলোচনে ! শিবাত্মিকে !
ভবাসুলিপ্রহেলনাং প্রদীপয়ন্ জগজ্জগম্ ।
ভমোহরঃ করঃ স্তম্বেৎ সদাগতিঃ স্মৃতি চ
সদৈবমৎসুধাকরে ! তবৈব সা কৃপাচ্ছবিঃ ॥

(৮)

ইদংশিবে ! চরাচরং স্বয়ৈব লক্শীৰণং
স্বয়িন্ধিতং কিয়দ্দিনং পুনস্বয়িপ্রলোভতে ।
তথাপি মোহতো জনৈরহংকৃতৌসদাস্থিতং
দয়াময়ি ! ক্ষমস্বতৎ তবৈব সস্তুত্রিক্ৰটিম্ ॥

(৯)

সমেহিসর্বদমঙ্গলে, বিধেহিমঙ্গলং শিবে !
অনন্তদুঃখবারিধৌ নিমগ্নসুপ্তভারতম্ ।
বিলোকয়, প্রবোধ্যতাং প্রবোধরূপিণি ! স্বতঃ
তবৈবভারতং প্রিয়ং সদাস্থিতং সদাস্থিতম্ ॥

(১০)

ইদং জগজ্জগময়ি ! প্রতিচ্ছবিস্তবৈবতু
জগৎপ্রপঞ্চরূপিকে ! জগৎপ্রপঞ্চকৈঃ কিমু ?
ততঃ কিমত্রপূজনে প্রদেয়মস্তিশারদে !
স্বভাবতোহনুকম্পয়া যদি স্বয়ং বিদুষ্যসি ॥

(১১)

নীরূপেহখিলরূপিকে ! গুণময়ি ! ত্রৈলোক্যহীনাত্মিকে
দুর্গে ! দুর্গভবাকিত্তম্ভয়কুংপ্রাস্তোক্তিমাকর্ষণ ।
আনন্দামৃতসেচনেন যুক্তকং সঞ্জীব্যতাং ভারতং
সুয়াক্তান্তিরবিচ্যুতা, তবপদে ভক্তিঃ পরাধাখ্যতী ॥

(১২)

ভোঃ শর্কবাণি ; তবাগমেন উ নিতানন্দেনমুক্তাবয়ং
কিংবাচ্যং কিমুদেয়মস্তিশুভদে । তন্নৈবজানৌমহে ।
কামাদিঃ বলিমদুতং সিপুচয়ং ভক্তিকং পুষ্পাঞ্জলিং
যজ্ঞাক্ষয়ং গৃহগদেবি ! তদিদংমাদিস্মর হংসুতান্ ॥

(১৩)

জ্ঞানিবৃন্দচিত্তনিতরাজহংসরূপিকেহ
জ্ঞাননৈত্যখণ্ডকারি বোধখণ্ডগধারিকে ।
পাপতাপশাস্তিকারি-শাস্তিবাবিদায়িকে ।
এহিদেবি ! দেহি শর্ম্ম রক্ষ দক্ষপুত্রিকে ।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যস্মৃতিতীর্থচ্ছাত্রাণাং

নিবেদনমেতৎ ।

গণপতির গণপতি-দর্শন ।

“বিশ্বাসে মিলার কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর ।” শাস্ত্র গড়িয়া বেদনেদান্ত আলো-
চনা যারা তর্ক ত্রিনিষটা বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভগবান্‌লাভ হয় না ।
ভগবান্‌ তক্তের বাঞ্জাকল্পতরু--ভক্তাধীন—তিনি ভক্তির ডোরেই বাঁধা পড়েন ।
ভক্ত তাঁহাকে যেক্রপেই দেখিতে চায়, তিনি সেইক্রপেই তাহাকে দর্শন দেন ।
একথার জাজল্যমান সাকী গণপতি উট ।

গণপতিভট্টের নিবাস কর্ণাটপ্রদেশে । গণপতি নামেও গণপতি, কাজেও
“গণপতি” ভিন্ন অন্য কাহাকেও জ্ঞানেন না । দিনরাত গণপতির ধ্যান—
গণপতির পূজা—গণপতির অর্চনাতে গণপতির দিন অতিবাহিত হইত—গণ-
পতিই গণপতির ব্রহ্ম । গণপতি শুনিলেন, নীলাচলে গেলে ব্রহ্মদর্শন হইতে
পারে । গণপতি উর্দ্ধ্বাসে নীলাচলের দিকে ছুটিলেন । কঙ্করময় রাস্তায় পদ-
যুগল কত বিকৃত হইতেছে—কণ্টকের উপর কণ্টক বিধিয়া গণপতির দেহ
হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতেছে—প্রচণ্ড মার্শ্বওতাপে সমস্ত দেহ

ঘর্ষাক্ত হইতেছে, গণপতির সে দিকে ফ্রেপও নাই, তিনি প্রাণপণে ছুটি-
তেছেন নীলাচলে ব্রহ্মদর্শনে। অশ্রান্ত পথচারীর পর প্রায় মাসাধিককাল
পরে গণপতি প্রায় নীলাচলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথক্রান্তিতে
পথিপার্শ্বস্থ এ-টা ক্ষুণ্ণ-ক্রান্তলে বসিয়া আছেন, এমনসময়ে দেখেন, কাঁতাবে
কাঁতাবে বহুযাত্রী নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। গণপতি তাহাদের
জিজ্ঞাসা করিলেন “ওগো ভোগরা কোথায় গিয়াছিলে?” পথিকেরা উত্তর
করিল “আমরা নীলাচলে ব্রহ্মদর্শনে গিয়াছিলাম।”

গণপতি তাহা শুনিয়া ভাবিলেন,—এরা যদি নীলাচলে ব্রহ্মদর্শনেই গিয়া
থাকে, তবে ফিরিয়া আসিল কিরূপে? ব্রহ্মদর্শন করিয়া কেহও ফিরিয়া
আসেনা! ব্রহ্মকে দর্শন করিলে সে যে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়—আর ভাঙ্গাকে
এই আধিক্যধি-জরা-যরণ-প্রপীড়িত সংসারের কুটিলচক্রে পড়িয়া চূর্ণীকৃত
হইতে হয় না। তবে এরা মিথ্যাবাদী, নিশ্চয়ই এরা মিথ্যা কথা বলিতেছে।
এই ভাবিয়া গণপতি নীলাচলাস্তিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দূর অগ্রসর
হইতে না হইতেই আর একদল তীর্থযাত্রীর সহিত গণপতির সাক্ষাৎ হইল।
গণপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ওগো ভোগরা কোথায় গিয়াছিলে?”
তাহারাও বলিল “নীলাচলে।”

তখন গণপতি বসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, “তবে কেন মিছা পথশ্রমে ক্লান্ত
হই। নীলাচলে সত্যই তবে ব্রহ্ম নাই। যদি থাকিতেন তবে ইহারা কেন
মুক্ত না হইয়া ফিরিয়া আসিলে। যাই, যাদের ছেলে বরে ফিরিয়া যাই।”

এই ভাবিয়া গণপতি স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে নীলা-
চলে বসিয়া যিনি সর্বশাস্ত্রধামী—তিনি সনস্তই জ্ঞানিতে পারিলেন। উক্ত-
বংশজ জগন্নাথ অমনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে গণপতির সম্মুখে উপস্থিত
হইয়া বলিলেন—“ওগো মশায়, তুমি কোথায় যাঁতেছিলে, আর ফিরিয়াই বা
চলেছ কেন?”

গণপতি একটু বিরক্তস্বরে বলিলেন, “শুনবে কি মশায়, যাঁচ্ছিলেম নীলা-
চলে জগন্নাথদর্শনে, আমি জান্তেম জগন্নাথ স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁকে দেখলে
জীবের আর সংসারের তাপে দগ্ধ হইতে হয় না—সে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধ, মুক্ত
হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়। কিন্তু শুনবে কি মশায়, পথে যেতে যেতে
আমার সহিত অনেক যাত্রীর দেখা হইল, তাহারা সকলেই বলিল যে,
“নীলাচল হইতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া আসিতেছি,” তাহা শুনিয়া আমি ভাবিলাম,

“হ’লে নীলাচলে ব্রহ্ম নাই—ব্রহ্ম নাই—যদি থাকতেন, তবে নিশ্চয়ই এরা মুক্ত হ’রে ফিরে আসত না।”

ব্রাহ্মণবেশী জগন্নাথ গণপতির কথা শুনিয়া এফুট হাসিয়া বলিলেন, “ওগো মূখার, তুমি ভুল বুকেছ। নীলাচলে ব্রহ্ম আছেন। তুমি সেখানে গেলে তাঁর দর্শন পাবে। তিনি ভক্তবাহুস্বয়ং। তাঁর নিকট ভক্ত যে বাঞ্ছা প্রকাশ করে, তিনি তাহার সেই আশা পূর্ণ করেন। যে তাঁর নিকট মুমুকু হইয়া যায় সে মুক্ত হয়—যে তাঁর নিকট ধন চায় তিনি তাহাকে ধন দেন—যে বিত্তা চায় তাহাকে তিনি বিত্তা দেন—তিনি যে বাঞ্ছাকল্প-ভরু। তুমি মুমুকু হ’য়ে তাঁর নিকট যাও, তুমি মুক্তি পাবে।”

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া গণপতির মনের ভাব পরিবর্তিত হইল। তিনি ফিরিয়া নীলাচলের দিকে প্রধাবিত হইলেন। গণপতি যেদিন জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, সেদিন ভাগ্যক্রমে জগন্নাথের স্নানযাত্রা। শত শত—সহস্র সহস্র যাত্রী জগন্নাথের রথচক্র আকর্ষণ করিতেছে—রথের উপর জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা আসীন। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। বড় মনোরম। গণপতি সেই চিরবাহিত জগন্নাথের বিগ্রহের নিকট দাঁড়াইলেন, পাণ্ডাগণের নিবেদন সম্বন্ধে জগন্নাথের হাতে মুখে হাত বলাইলেন—কিন্তু কি দেখিলেন? দেখিলেন, এ মূর্তিও তাঁহার আরাধ্যদেবতা গণপতি নহে! এ দেবতারও গণপতির মত শুণ্ড নাই—পেটটীও তাঁহার মত নহে—এ দেবতার মেরুপ দু’টী দাঁতও নাই। অতএব দেবতা কিছুতেই ব্রহ্ম নহে। এই ভাবিয়া গণপতি বড় বিরক্তভাবে নীলাচল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে অন্তর্যামী জগন্নাথ সমস্তই জানিতে পারিলেন। ভক্তের অবিমিশ্র ভক্তি দেখিয়া ভগবান্ মনে মনে বড় আনন্দ পাইলেন। ভক্ত মনে ব্যথা পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া ভগবান্ কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি আবার সেই ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া গণপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “ওহে মহাশয়! তুমি ওরূপ ক্রোধাক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছ কেন?”

গণপতি ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন—“যাও ঠাকুর যাও, তুমি ব্রহ্ম দেখাবে ব’লে মিথ্যা কথার ভুলিয়ে শেষে এক কাঠের পুতুল দেখালে। ঐ কি আমার ব্রহ্ম? আমার ব্রহ্মের যে মুখে শুণ্ড, দু’টী বড় বড় দাঁত, আর পেটটি তাঁর মত বড়।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ওগো মহাশয়, এবার চল, এবার তুমি নিশ্চয়ই ভোগার
ব্রহ্মকে দেখতে পাবে। আমি বলছি পানে।”

গণপতি ব্রাহ্মণের কথায় ফিরিয়া গেলেন। ঘাইয়া দেখেন, সত্য সত্যই জগন্নাথ
গণপতির আকারে রথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। গণপতি তদর্শনে একে-
বারে ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। ভক্তিগদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন “ওহে
ঠাকুর, যদি দেখা দিয়াছ ত বল যে, প্রতিবৎসর এমনইভাবে স্নানযাত্রার
দিন এই বেশেতেই দেখা দিয়ে আমার মান বজায় রাখিবে।”

জগন্নাথ ঘঁড় নাড়িয়া সন্মতি দিলেন। তখন ভাববিহীন গণপতি গলদংশ-
লোচনে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন—একদৃষ্টিে সেই বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া
রহিলেন—তঁহার দেহ হইতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ বাহির্গত হইয়া ভীরবেগে তাহা জগ-
ন্নাথের দেহে প্রবেশ করিল—গণপতির সংজ্ঞাহীন দেহ কেবল পড়িয়া গেল।
ভক্তবীর গণপতি গণপতির দেহে বিলীন হইলেন।

কত দিম হইল গণপতি পুরুষোত্তমে গণপতি দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু
আজিও জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিনে গণেশবর্ষে ভক্তের সম্মুখে আনিভূত
হন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

(পূর্বাসুত্ত)

ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ ।

কর্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ ॥ ৭১

সাধয়ব্যাখ্যা । ইহে পরস্তপ (শত্রুতাপন অর্জুন) ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিশাং
(ব্রাহ্মণত্র বৈশ্বানার) শূদ্রাণাঞ্চ স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবঃ ত্রিগুণাস্ত্রিকা
প্রকৃতিঃ যথা পূর্বজনসংসারঃ তৎপ্রভবৈঃ তস্মাৎ প্রার্থুতৈঃ গুণৈঃ সবাদি-
ভেদৈঃ) কর্মানি প্রবিভক্তানি (প্রকৃর্ষণেণ বিভক্তানি) ৪১

ব্রাহ্মণ্যাদি । হে অর্জুন, প্রকৃতিভেদে সবাদি-গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ কৃত্রিয়
বিশিষ্ট শূদ্রদের কর্মসকল পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত হইয়াছে। ৪১

আলোচনা । ভগবান্ চতুর্দশ অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন—

সখ্যং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্বাঃ ।

নিবন্ধস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

প্রকৃতিজাত সখ্য রজঃ তমঃ এই তিন গুণ দেহে থাকিয়া দেহীকে দেহে
করুন করে—অর্থাৎ পুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করিবার হেতুই সখ্যাদি তিন গুণ ।
চতুর্দশ অধ্যায়ের ১০শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

গুণানেতানভীতা ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাতুঃখৈঃ বিমুক্তোহিমৃতমশ্নুতে ॥

অর্থাৎ দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া দেহী জন্ম-
মৃত্যু-জরাজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন । গুণত্রয়
অতিক্রম করিতে না পারিলে দেহী অর্থাৎ জীব অন্তপ্রকারে মুক্ত হইতে
পারে না, অথচ সংসারের প্রাণিসমূহ এবং তাহাদের ক্রিয়া কর্ম জ্ঞান
বুদ্ধিধৃতি শ্রদ্ধা দান আহার সকলই ত্রিগুণাত্মক বলিলেন । যদি ত্রিগুণ ছাড়া
কিছুই না, হয় তবে জীবের মুক্তি কি উপায়ে হইতে পারে ? ভগবান্ চতুর্দশ
অধ্যায়ে ২২ । ২৩ । ২৪শ শ্লোকে গুণাতীতের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং ২১শ
শ্লোকে অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্নের—“কথং চৈতাং ত্রীন্ গুণনতিবর্ত্ততে” অর্থাৎ
কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায়, ইহার উত্তরে ২৬শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে,
যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিস্বৰূপে আমার সেবা করেন, তিনি গুণত্রয় অতিক্রম
করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন । পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৩৪ ও
৪র্থ শ্লোকে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারকে কণবিক্ষংসি অশ্বখবৃক্ষরূপে কল্পনা
করিয়া, বিষয়-বৈরাগ্যরূপ শত্রু দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া, মোক্ষপথের অন্বেষণ
করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন । ষোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শাস্ত্রাঙ্কসম্মে
বর্ণাশ্রমধর্মের অনুগত থাকিয়া বধাবিধান কার্য্য করাই সর্বশুদ্ধি সম্যক জ্ঞান
মুক্তিমূল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এক্ষণে ভগবান্ এতাবৎ বাক্যের
নামসম্বন্ধ করিয়া বেদশাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্মের অত্যাৱশ্যকতা দেখাইতেছেন ।

ইহাধারা বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ প্রকৃতিজাত সখ্যাদি
গুণাত্মক শাস্ত্রোক্ত বিধানে স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্য করিলে ভগবানের
প্রীতিউৎপাদন করিতে সমর্থ হন । ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হইলে পুরুষ
বিবেকবৈরাগ্যরূপ অসম্ব শত্রুর এবং ভগবানের প্রতি অব্যভিচারী
ভক্তিনাভের অধিকারী হইতে পারেন । ইহাই জীবের মুক্তির স্বেপান ॥

এছাড়া ভগবান্ ব্রাহ্মণ ক্রিয় বৈশ্য শূত্র চারিবর্গের বর্ণাশ্রমোচিত গুণ ও কর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এখানে একপঙ প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা একই জীবের সকলকে একপ্রকার সৃষ্টি না করিয়া কেন ভিন্ন ভিন্নরূপ করিলেন এবং তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মের বিধানই বা কেন? উদ্ভূতরে ভগবান্ বলিতেছেন “স্বভাবপ্রভবৈশ্বৈতনঃ” অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অথবা পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারই ইহজন্মের স্বভাব হয়। সেই স্বভাব-প্রভাব হইতে জাত যে গুণ, তাহাই বিভিন্নরূপের কারণ; উহাতে পরমেশ্বরের কোন পক্ষপাতিতাই নাই। অনাদিকালসিদ্ধসংস্কারবশতই এইরূপ হইয়া থাকে। মহাদি-গুণভেদে এইপ্রকার বর্ণভেদ এবং বর্ণভেদে কর্মাদিকার বেদে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ চতুর্থ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকেও বলিয়াছেন “চাত্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম-বিভাগশঃ”—এই গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে চতুর্বর্ণের মধ্যেও শাস্ত্রে শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। অত্র সংহিতার ১৬৪ শ্লোকে গুণকর্মভেদে ব্রাহ্মণকেই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—

দেবো মুনির্ষিকোরাজা বৈশ্যঃ শূত্রানিষাদকঃ ।

পশুয়েচ্ছৈহপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ অত্র ৫৬

স্ব স্ব গুণক্রিয়া অনুসারে ব্রাহ্মণগণ দেব মুনি ষিক রাজা বৈশ্য শূত্র নিষাদ পশু য়েচ্ছ ও চণ্ডাল এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। অত্রি-সংহিতায় ১৬৪ হইতে ১৭৪ শ্লোকে এই দশ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্কণ বলা হইয়াছে। এগুলে উৎসমুদয় উদ্ধৃত করা অপ্রয়োজন। এই ধর্মচ্যুতি হইতেই বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি। তাহাদের ধর্ম কর্ম শাস্ত্রে পৃথক পৃথক বর্ণিত হইয়াছে। যখন কর্মভূমি এই ভাবভবর্ষে বৈদিকধর্মের প্রাধান্য ছিল, যখন রাজগণ বৈদিকধর্মকেই ধর্মার্থ-কাম-মোক্চ চতুর্বর্ণের মূল বলিয়া জানিতেন, তখন গুণকর্মের ভারতম্য অনুসারে বর্ণবিভাগ হইত। এখনও বর্ণ-ধর্মচ্যুতি নিত্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সে বৈদিক শাসন নাই, সুতরাং এখন আর সে বর্ণ-বিচার নাই। বর্ণবিচার সামাজিকভাবে হিতকর কিনা, তাহার সীমাংসা অতি জটিল, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে যে আবশ্যিক, তাহার আর সন্দেহ নাই। গুণকর্মের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে যে আধ্যাত্মিক অগতে উন্নতি অবনতি হয়, দাসীপুত্র নারদের দেওর্ষি এবং ভরত ঋষির পশুবোনি-প্রাণি-ভাষার চরম দৃষ্টান্ত। ৪১

শমোদমস্তপঃ শৌচং কাশ্মিরার্জবমেবচ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজং ॥ ৪২

সাধনব্যাখ্যা । শমঃ (চিত্তসংযমঃ) দমঃ (ইন্দ্রিয় সংযমঃ) তপঃ (সপ্তদশা-
ধায়ায়ুক্তং শরীরং বাচিকং মানসং) শৌচং (বাহ্যাত্মনঃ শুদ্ধিঃ) কাশ্মিঃ (কমা)
আর্জবং (সারল্যং) জ্ঞানং (বেদশাস্ত্রাণাং পদব্যাখ্যার্থ-জ্ঞানং) বিজ্ঞানং
(শাস্ত্রাদিত্যবিনিশ্চয়ঃ) আস্তিক্যং (কর্মণি তৎ ফলে শ্রদ্ধা, অস্তি পরলোক
ইতি নিশ্চয়ঃ) এতৎ স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম (ব্রাহ্মণশ্চ স্বভাবজাতং কর্ম) ৪২

ব্রহ্মসুবাদ । মনঃ সংযম, বাহ্যেইন্দ্রিয়সংযম, তপস্শ্রা, শুচিতা, কমা, সরলতা,
শাস্ত্রার্থবোধ, শাস্ত্রতত্ত্ব নিশ্চয়, কর্মফল ও পরলোকে বিশ্বাস এই নয়টি ব্রাহ্মণের
স্বভাবজাত ধর্ম ও কর্ম । ৪২

আলোচনা । সত্বগুণের লক্ষণ ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ ৯ম ১১' ১৪
১৬। ১৭। ১৮শ শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে ২৩শ হইতে কতিপয় শ্লোকে
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্রাহ্মণগণ সহজতঃ সত্বগুণবহুল প্রশান্ত । ব্রাহ্মণের
স্বভাবিক নয়টি গুণের উল্লেখ হইল । শমঃ--অর্থাৎ অন্তঃকরণের বাহ্যবৃষ্টি-
সংযমন, দম--চক্ষুঃকর্ণদিকে বাহ্যবিষয়-ভাগ হইতে নিয়মিতরূপে দমন, তপঃ--
সপ্তদশাধায়ায়ুক্ত শারীরিক বাচিক ও মানসিক তপস্শ্রা, শৌচ--বিবেকদ্বারা
মন শুদ্ধি এবং পবিত্র মৃত্যুলাদি দ্বারা শরীরশুদ্ধি, কাশ্মিঃ--যে বৃষ্টির দ্বারা
মনুষ্য লাজিত হইয়াও সাধামত ক্রোধোপশম করিতে পারে তাহাই কাশ্মিঃ ;
আর্জব--সরলতা, জ্ঞান--শাস্ত্রার্থ-বোধ, বিজ্ঞান--শাস্ত্রতত্ত্বের মর্মার্থবোধ,
আস্তিক্য--কর্মফল ও জন্মান্তরবিশ্বাস । সত্বগুণাত্মক এই নয়টি গুণ ব্রাহ্মণের ।
কত্রিয়াদি বর্ণেরও এই সকল গুণ থাকিতে পারে না এমন নয় । তবে এই
সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজ এবং বিশেষ ধর্ম ; অন্তবর্ণেরও কল্যাণকর
জন্মান্তরে কুশলের হেতু । ৪২

শৌর্ধ্যং ভেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্ ।

দীনমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩

সাধনব্যাখ্যা । শৌর্ধ্যং (শূন্যভাবঃ পরাক্রমঃ) ভেজঃ (প্রাগলভ্যং) ধৃতিঃ
(ধৈর্য্যং ধারণম্) দাক্ষ্যং (নৈপুণ্যং কৌশলং) যুদ্ধেচ আপি অপলায়নং (যুদ্ধে
অপরাস্থতা) দানং (ঔদার্য্যং যোগ্যপাত্রেষু মুক্তহস্ততা) দীনমীশ্বরভাবঃ
(প্রভূশক্তিপ্রকটীকরণং নিরদনশক্তিঃ) ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজং (এতৎ
কত্রিয়শ্চ স্বভাবিকং কর্ম) । ৪৩

বজ্রাস্ত্রবাদ। শূরত্ব, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাধুত্ব, দান, প্রভুত্ব এই কয়েকটি ক্রিয়ের স্বভাবভিত্তিক কর্ম।

আলোচনা। ক্রিয় মিশ্রিতস্বরূপে গণবিধিষ্ট। ক্রিয়ের যে কয়েকটি কর্ম উক্ত হইল, ইহাও স্বত্ব ও রাজ্যগুণাত্মক। শৌর্য্য—বলবান্ শত্রুকে দমন করিবার পরাক্রম। তেজ—অশ্রু কর্তৃক পরাভূত না হইবার শক্তি। ধৃতি—ধৈর্য্য বিপদে পড়িগাও অবিচলিত থাক। দক্ষ্য—কার্য্যকুশলতা। যুদ্ধে অপলায়ন—পুনঃ পুনঃ শত্রুকর্তৃক আহত হইয়াও পরাধুত্ব না হওয়া। দান—যোগ্য পাত্রের আত্মস্বত্ত্বাগপূর্ব্বিক গো স্তবর্ণ ভূম্যাदि অর্পণ। ঈশ্বরভাব—অধীম বর্ষ বা দুর্ভিক্ষের দমন অথ প্রভুত্ব নিয়মনশক্তি। এই সকল স্বরূপে গণোচিত কার্য্য ক্রিয়ের। এইসকল বর্ণোচিত কর্ম প্রতিপালন করিলেই ক্রিয়গণ স্বধর্ম্ম-পালন-অথ পুণ্যাধিকারী হইতে পারেন। ৪৩

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

প্রতীকার।

জলভরা তারা ছুঁ'তে বুকভরা বাখা নিয়ে
কেগো তুমি উন্মাদিনী আছ ঘরে দাঁড়াইয়ে ?
কেন গো কোমলকরে মথিয়া মাখন নানা
কেবল ছয়ার ঘর করিতেছে আনা-গোনা ?
আঁখিজলে ধরা ভাসে অরুস্তদ কি বেদনা ?
তবুও যে গেছে চলে সে কিরে আর এল না।
কেন শিখিপাখা ধরি আদর করিছ তুমি ?
কাকপক্ষে কেন বন্ধে সোহাগে ধরিছ চুমি ?
কেন কাঁদ নন্দরাণী আছ কাঁর প্রতীকার ?
সে যে স্থখে রাজপাটে আছে বসে মথুরার ॥

সুপ্রাঃসু-গুণিত কেশপাশে করি করার্পণ,
বামকরে স্তম্ভ গণ্ড বহু খাস বনেখন।

স্নেহের নিবারণ যদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেছে
 বিরহ অশনি-পাতে, যে টুকু বা বাঁকি আছে,
 করেছে আবৃত তার তীব্রভাবে অভিমান ;
 "আমি তার পিতা বটে সে ত আমার সন্তান।"
 সন্তানের অদর্শনে অভিমান দূরে যায়
 সম্মোহ আবেশে জানী ভূপতিত নল রায় ।
 মোহ আবরণে মুক্ত আছ তুমি প্রতীকার,
 কিন্তু সে যে রাজা হ'য়ে আছে স্মৃথে মথুরায় ॥

কে তুমি চোখের জলে ভিজিয়ে কদমতলা
 আঙ্গুলু-কেশরাপি পাগলিনী প্রায় বাল্য ?
 বসন্তসখারে কেন গঞ্জিতেছে বিধুমুখী,
 সেও কাল বটে, কিন্তু তব দুঃখে মহাদুঃখী ।
 গুলার ফেলেচ দূরে চূয়া কুঙ্কুম চন্দন ;
 কিন্তু কি আসিবে তাতে কিরে শ্রীনন্দনন্দন ?
 ভাঙ্গিয়াছ আভরণ শ্রীঠীন হয়েছ বেশ ;
 দয়ানিধি নাম তার দয়ার নাহিক লেশ !
 কদমের তলে বাল্য আছ মিছে প্রতীকার
 সে যে স্মৃথে রাজপাটে অ'ছে বসে মথুরায় ॥

শ্রীবৈষ্ণনাথ কাব্যতীর্থ ।

ভক্তি-কথা ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

নিরন্তর শঙ্করাশি লটয়া নাড়াচাড়া করা বৃথা, ধর্মের অন্তর্ভূলে
 প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, নচেৎ ভাব হারাষ্টয়া শঙ্কররূপ
 মহাবনে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। নিজের অপেক্ষা আগার শ্রেষ্ঠ।
 কৃত্তিক নিভের পথ হারাষ্টয়া কান্তারে বিচরণ করিতে থাকে। পাণ্ডিত্য,
 আভিজাত্য, কৌলীভ, ধনবস্তু কিছুতেই ধর্ম মিলে না, তাই কেবল ভাবপ্রবণ

হৃদয়। হৃদয়ের বস্তু হৃদয়েই ধরিতে হইবে। সুতরাং হৃদয়খানা পবিত্র করা আবশ্যিক, মতেঃ ভগবদর্শন অসম্ভব। শৈবালদলে আচ্ছন্ন কমলিনী সৌন্দর্যলাভে বঞ্চিত থাকে।

ধর্ম, সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ—তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিষ নহে। গ্রাস হইতেও উহা পাওয়া যায় না। অগতের সর্বত্র চুড়িয়া আসিতে পার, হিমালয়, আল্পস্, কাকেশস্ প্রভৃতি খুঁড়িয়া ফেলিতে পার, সমুদ্রের অতলতল আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চাঁরি কোণে অথবা গবি-গরুভূমে, চতুর্দিক ভ্রম ভ্রম করিয়া দেখিতে পার, কোথাও উহা পাইবে না—যতদিন না তোমার হৃদয় উহা ধারণা করিতে সমর্থ হইতেছে, ও যতদিন না তুমি গুরু লাভ করিতেছ। বিশ্বাত্মদিক্ট এই গুরুলাভ যখনই হইবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলভায় তাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া দিবে। তিনিই যথার্থ পথপ্রদর্শক, আর সগাই বাক্যের যন্ত্র মাত্র। সাধারণ গুরুশ্রেণী হইতে উচ্চতর আর একশ্রেণীর গুরু আছেন, ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা স্পর্শ ঘাতা, এমন কি কেবলমাত্র ইচ্ছাঘাতা অপরের ভিতর ইচ্ছাশক্তি-প্রভারে ভগবন্তাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অভিদূরচার ও মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়। ইঁহারা সকল গুরুর গুরু, মানুষের ভিতর ঈশ্বরের অভিব্যক্তি।

আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া বাতীত ভগবান্কে দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাদিগের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না। ঐ সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের ঈশ্বর দেখিবার আর উপায় নাই। যদি আমরা আর কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা কিছুত কিম্বাকার জীবগঠন করিয়া ফেলি, ও উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। একটা প্রচলিত কথা আছে যে, কোন আনাড়ী শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ, যখনই আমরা ভগবান্কে নিগূর্ণ পূর্ণস্বরূপে ভাবিতে যাই, তখনই অসুখকার্য হইয়া থাকি। কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে উচ্চতর কখনই ভাবিতে পারি না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মনুষ্য প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপাবোধে সমর্থ হইব। কিন্তু যতদিন মনুষ্য থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যত চেঁচাই কর না কেন, ভগবান্কে মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে, অগতের সকল

বস্তুর সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্কসম্বিৎ বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এসকল মনুষ্যস্বভাবের কথা সব ভ্রমাত্মক, ইহা এমনভাবে প্রমাণ করিতে পার, বাহাতে ভোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি বলে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? এইরূপ অসুত বিচারবুদ্ধি দ্বারা কি লক্ষ হয়? শূন্য—কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। সে সকল শব্দদ্বারা ভাববিশোধের উদয় হয় না। মাত্র শব্দাড়ম্বরকারী ৭ সামান্ত ইত্যর বক্তিতে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শাস্ত্রপ্রকৃতি, জগতের শাস্তিতত্ত্ব করে না, আর বৃথাবাক্যব্যয়কারী ব্যক্তি জগতে অশান্তি ও দুঃখ আনয়ন করে। প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত ধর্ম কথায় কথা মাত্র। সুতরাং বৃথাবাক্যব্যয় ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে প্রভেদ দেখা আবশ্যিক। আত্মার গভীরতর প্রদেশে আমরা বাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এ বিষয়ে সহস্রজ্ঞান যত চুলভ আর কিছুই তত নহে। যত যত সীমা অতিক্রম করিয়া কেহই ভগবানের কল্পনা করিতে পারে না। যদি কেহ বলে যে, “আমাদিগের গভীর বাহিরে কিছু কল্পনা করিতে পারি,” তবে সে প্রলাপভাষী বিকৃতমস্তিষ্ক।

ভগবান্ মানবের দুর্বলতা বুঝেন, আর মনুষ্যের হিতের জন্য অন্তর্নিহিত হন, কিন্তু মূর্খেরা তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধিতে না পারিয়া উপহাস করে। যখন বন্যা আসে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল কিনারা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন জগতের ভিতর মহান্ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। সেখানকার তাঁওযাতেই যেন ধর্মতাব খেলিতে থাকে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার মামই ভক্তি। দেব, পিতৃ বা অন্য কোন উপাসনা ভক্তি-পদবাচ্য নহে। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্ম-কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, উহা উপাসককে কেবল কোনপ্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফলপ্রদান করে। উহাতে ভক্তির উদয় হয় না, কোনপ্রকার মুক্তিও প্রসব করে না। ভক্তি, ধর্মপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলিকে ঘৃণা করিতে নিবেদন করে। প্রতিনিয়ত ভাবপরিবর্তন দ্বারা কোঁতুলনিবৃত্তি ধর্ম নহে। আকিষের নেশার মত একটা প্রবল ঝোঁকও ধর্ম নহে।

ভক্তিপান্থ বিখ্যাতী সাধক, সাধনার অগাধমলে ডুবিয়া যায়, আর অন্তর্ভিকে হ'র না। বিবেক, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্যাস, ব্রহ্ম, শৌচ, বল ও অনুভব হইতে অস্তিত্ব হয়। রাসানুভবের মতে খাড়াখাড়া-বিচার। তাঁহার মতে

খাত্তব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটি (১) জাতিদোষ অর্থাৎ খাত্তের এককৃতিগত দোষ যথা, বস্তুন পৌরাজ প্রভৃতি সম্ভাব্যতই অশুচি। (২) আশ্রয়দোষ, অর্থাৎ পণ্ডিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ। (৩) নিমিস্তদোষ, অর্থাৎ কোনও অশুচি বস্তুর, যথা, কেশ, মূলি আদির সংস্পর্শজনিত দোষ। শ্রুতি বলেন,—“আহারশুদ্ধৌ মনুশুদ্ধিঃ মনুশুদ্ধৌ ক্রমাস্মৃতিঃ” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭ম অ ২১ খণ্ড) শুদ্ধ আহার করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে জগদানকে সর্বদা স্মরণ করা হয়। খাত্তাখাত্ত-নিচার ভক্তিমার্গাৎলক্ষ্য-গণের মতে চিরকালই একটি গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্তসম্প্রদায় এ বিষয়টিকে অনেক অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন, যটে, কিন্তু উহার মধ্যে একটি গুরুতর সত্য নিহিত আছে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্ব, রজ, তমঃ, যাহাদের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি ও বাহ্যিক বৈষম্যাদি প্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হয়। ঐ উপাদানেই সমুদয় নরদেহ চিন্মিত। উহাদের মধ্যে সত্ত্বাদর্শ অত্যন্তাশুচী। উহা হইতেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। আমরা আহার দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়, অতএব খাত্তাখাত্তবিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাস্তবিক খাত্তের শুদ্ধাশুদ্ধ-নিচার গৌণমাত্র। কিন্তু আত্মকাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদি বিষয়ে এক কাড়াবাড়ি হইয়াছে, যেন তাঁহারা ধর্মকে রামায়ণে পুরিয়া-ছেন। কখনও মে সেই ধর্মের মহান সত্যসমূহ তথা হইতে বাহিরে আসিয়া আধ্যাত্মিকতার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ধর্ম এক বিশেষ প্রকারের ডড়াদ মাত্র। উহা জ্ঞান নহে, ভক্তি নহে, কর্মও নহে; উহা একপ্রকার পাগলামি মাত্র। যাহারা এই খাত্তাখাত্তনিচারকেই জীবনের সারকারী স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি না হইয়া বাতুলালয়ে গতিই অধিক সম্ভব। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাত্তাখাত্তনিচার মনের স্থিত্তাক্রম উচ্চাংশলাভের রূপ বিশেষ আবশ্যিক, নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না। তাহদের ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ভিমুখী গতি নিবারণ ও উহা-দিগকে সংযত করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন সফলধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। তাহদের আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস পরমাত্মকে। আমরা আত্মার

ভিতর কত বিচিত্ররূপে অনুভব ও কত গভীরভাবে সম্বোগ করিতে পারি-
 তার কি ইয়ত্তা আছে ? কিন্তু, সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল অভ্যাস
 ব্যতীত কখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। মন যেন
 সর্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। প্রথম প্রথম ইহা বড় কঠিন
 বোধ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়সহকারে চেষ্টা করিতে করিতে এই চিন্তার শক্তি
 ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির উপর ভক্তিপ্রাসাদ
 প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যশৌচ বা খাতাখাত, বিচার এই উভয়ই চাই। কিন্তু অন্তঃকরণ-
 শুদ্ধি ব্যতীত উহাদের কোনই মূল্য নাই। যোগাভ্যাস, অন্তঃশুদ্ধির উপায়-
 স্বরূপ নিম্ন লিখিত গুণগুলি নির্দেশ করিয়াছেন। সত্য, আর্জুন, বা সরলতা,
 দক্ষ, নিঃস্বার্থ পরোপকার, অহিংসা-কাত্মমনোবাক্যে পরের হিংসা না করা,
 অতিথ্যা-পরত্বে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টের ক্রমাগত চিন্তা
 পরিত্যাগ। এই তালিকার মধ্যে অহিংসাগুণটির সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা
 বলা আবশ্যিক। সকল প্রাণী সম্বন্ধেই এই অহিংসা ভাব অবলম্বন করিতে
 হইবে। কেহ কেহ যেমন মনে করেন, মনুষ্যজাতির প্রতি অহিংসাতাব
 পোষণ করিলেই যথেষ্ট, অগ্নিশূ প্রাণিগণকে হিংসা করিলে ক্ষতি নাই।
 আবার কেহ যেমন কুকুর বিড়ালকে লালনপালন করেন, বা পিপীলিকাকে
 চিনি খাওয়ান, কিন্তু নিম্ন ভ্রাতার গলা কাটিতেও বিধা বোধ করেন না। বাস্তবিক
 অহিংসা তাহা নহে, যদি দেখা যায় কোন লোকের ভিতর ঈর্ষার ভাব
 আদৌ নাই, তবেই বুঝিতে হইবে তাহার ভিতর অহিংসাতাব প্রতিষ্ঠিত
 হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি, সাময়িক উত্তেজনায়, অথবা কোনরূপ কুসংস্কার
 বা পুরোহিতকুলের প্রেরণায় কোন সংকল্প করিতে বা কোনরূপ দান
 করিতে পারে, কিন্তু তিনিই যথার্থ লোকপ্রেমিক যিনি কাহারও প্রতি
 ঈর্ষান্বিত নন। মচরাচর জগতে ষাঁড়াদিগকে বড়লোক বলিয়া থাকে,
 তাঁহার নাম, যশ, বা সামান্য একটুকুর স্বর্ণখণ্ডের জন্য পয়স্পারের প্রতি
 ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকেন। গোজাতি নিরামিষভোজী, মেষও তাহাট, তবে
 কি, তাহার পরম যোগী, পরম অহিংসক ? যে কোন মূর্থ ইচ্ছামত খাত
 বর্দ্ধন করিতে পারে। উদ্ভিদভোজী জন্তুগণ কেবল উদ্ভিদভোজন জন্য
 উন্নত পদবীতে আরূঢ় নহে, ইহারিও ভক্ষণ কোন খাত বিশেষ ত্যাগগুণে
 জানী হইয়া যায় না।

যে ব্যক্তি নির্দয়ভাবে বিধবা, বালকবালিকাদিগকে ঠকাইয়া লইতে পারে,
 অর্ধের জন্য যে কোন অন্তায় কার্য্য করিতে বাহার বিধা নাই, সে যদি

কেবল তৃণ ভোজন করিয়াও জীবন বাপন করে, তথাপি সে, পশু হইতে অধম। বাঁহার হৃদয়ে অপরের অনিষ্টচিন্তা পর্যাস্ত উদয় হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নহে, পরম পত্রর সৌভাগ্যেও আনন্দিত, সারা জীবন শূকরমাংস খাইলেও তিনি ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু। সুতরাং একটীই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, অন্তঃশুদ্ধির সহায়ক মাত্র। সেই লোককে ধিক্, সেই জাতিকে ধিক্, যে লোক, যে জাতি, ধর্মের সার ভুলিয়া অত্যাশ বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি মরণকামড়ে ধরিয়া থাকে। যদি ঐ অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের সহায় হয় তবে, উহাদের উপযোগিতা আছে বলিতে হয়। প্রাণশূণ্য, আন্তরিকতাহীন হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত। বল, ভক্তিত্বের আর একটা সাধন। ঋতি বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ ৩। ২। ৪ বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বাচিনাথ বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ।

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্ ।

(পূর্বানুবর্ত্ত)

অপিষদিবিশিখাঃ শরাসনং বা কুসুমময়ং সম্ভারস্বরং তথাপি
মমজগদখিলং বরোরুনাঙ্কামিদমভিলজ্যধৃতিং মুহূর্ত্তমেতি
তথাহি ।

অহল্যায়াজারঃ সুরপতিরভূদাত্তনয়াং
প্রজানাথোঃবাসীদত্তজতপোরোবিন্দুরবলাং
ইতিপ্রায়ঃ কোবানপদমপদেঃকার্য্যতময়া
প্রমোমদাগানাঃ কইহ ভুননোন্মাখবিধিবু

কাম। প্রিয়ে! তুমি ক্রীতভাবমূলক বিবেক হ'তে কেন অকারণ ভয়
বোঝে ?

যদিও কুসুমময় শরাসন মম
 আর পুষ্পময় বাণ, অতি সুকোমল ।
 মম আচ্ছা লজ্জি হয় ! তথাপি নরোরু ।
 মুহূর্ত না পারে ধৈর্য্য করিতে ধারণ
 সুরাসুর নর কিংবা অখিল জগৎ ।
 আমার অধীনে কেনা বিপথে গমন
 না করেছে সুন্দনা ? কর নিরীক্ষণ—
 আমার ইঞ্জিতে দেখ সুরপাতি হয় !
 হঠাৎ অচলাজার, ব্রহ্ম কন্যাগামী,
 ঋকপত্নী হরি চন্দ্র ভগতে বলকী ।
 মথিলেও হিতুনন বিশিখের মম
 মাছি হয় বিন্দুমাত্র অম চাক্ষুশীলে !

রতিঃ । অজ্ঞউত্ত । এবগ্নেদং তথাবি মহাসহায়সম্পন্নী শক্তিদেবী অরাণি
 জদোজস্ব জমনিঅম্পমুখা অমচ্চা সুনিগন্তি । †

রতি । আপনি যা বলেন সবই সত্য, কিন্তু সামান্য শত্রু ও যদি প্রবল সহায়-
 সম্পন্ন হয়, তা হ'লে তাকে ভয় ক'রে চলতে হয় । আমি শুনেছি এর যম
 নিয়ম প্রমুখ—কতকগুলি অমাত্য আছে, তাহারা বড়ই দুর্জয়, তাই এখানে
 ভয় হয় ।

কামঃ । প্রিয়ে ! যানেতঃনু রাজ্ঞানিবেকশ্চ বলবতো যমাদীনর্টৌ তাবদমাত্যঃনু
 পশ্যসি ত এতে নিয়তমস্মাতিরতিষুক্ত মাত্রাদ্রাগেব বিঘটিষ্যন্তে ।

তথাহি,—অহিংসাকৈবকোপশ্চ ব্রহ্মচর্যাদয়োমম
 লোভশ্চপূরতঃকেহমীদত্যাশ্চেয়াপরিগ্রহাঃ

কাম । প্রিয়ে ! মহারাজ নিবেকের যমনিয়ম প্রভৃতি যে বলনান্ আটটি
 অমাত্য দেখে, তুমি নিশ্চয় জেন—আমরা উহাদের সম্মুখীন হ'তে বা
 হ'তেই উহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোর্বে—

ব্রহ্মচর্য্য আদিকরি সকাশে আমার,
 অহিংসা কোপের কাছে, লোভ কাছে আর

† অর্থাৎ—এবমবৈতৎ তথাপি মহানহায়সম্পন্নঃ শক্তিব্যোহরাতিঃ
 যতোহস্ব যমনিয়ম প্রমুখা অমাত্যাঃ অরন্তে ইতি সৎ

সত্যাস্ত্রেণাপরিগ্রহ ত্যাজি প্রাণভয়

পাতিবে দাড়িতে বল কতক্ষণ হয় ।

যমনিয়মান প্রণায়াম প্রত্যাহার-ধ্যানধারণাসমাধিঃ স্তু নির্বিকারচিত্তে
সাধাহাদীষৎকরমসুসুপনা এব অপিচ স্মিয়এবামীষাৎকৃত্যা স্তেনতেহস্মদেগাচরা এব
বর্ত্তস্তেযতঃ ; — পশুবিলাসকনভাষণ-বিলাসপরিহারকেলি-পরিবস্তাঃ । স্মরণমপি
কামিনীনামলমিহ মনসো বিকাষায় । বিশেষতঃ চৈতে মদমান-মাৎসর্যাদস্তলোভা-
দিত্তিরস্মৎস্বামিবল্লভৈরভিযুক্ত্যগানা নরপতিমদ্রিণমধর্ম্মমেবাস্রয়িকৃষ্টি ।

আরও দেখ যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যানধারণা-সমাধি এ
সকলই একমাত্র নির্বিকারচিত্তসাধা, সুতরাং ইহাদের উচ্ছেদসাধন আমাদের
পক্ষে অতি সামান্য কাজ, কেন না রমণীই ইহাদের একমাত্র মারণাস্ত্র,
সুতরাং উহারাত আমাদের মুষ্টিও মশ্যেই রহিয়াছে । ত্রীলোকের দর্শন সস্তাষণ
বিলাস পরিহার কেলি আলিঙ্গন দূরে থাক, উহাদের স্মরণও চিত্তবিকার
অস্বাইতে যথেষ্ট সক্ষম, তবুও যদি কেহ ওপথে যায় সে-ও মদমান মাৎসর্য
দস্তলোভ প্রভৃতি আমাদের মহারাজের প্রিয়মোসাহেবগণের পরামর্শে
চালিত হ'য়ে রাজমন্ত্রী অধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করবে ।

রতিঃ । অজ্জউত্ত ! সুদং মএ ভুক্ষাণং সমদম্প্পজ্জদীণং অ একং
উপ্পত্তিষ্ঠাণংত্তি । †

রতি । আর্ধ্যপুত্র ! আমি শুনেছি তোমাদেরও শমদম প্রভৃতির নাকি
একই উৎপত্তিস্থান ?

কামঃ । প্রিয়ে কিমুচ্যতে একমুৎপত্তিস্থানমিতি নসুজনক এবাস্মাক-
মভিঃ । তথাহি ;—

সত্ত্বঃ প্রথমমিহেশ্বরশ্রুসঙ্গা-

স্ম যয়াঃ মনইতি বিশ্রুতবৃনূতঃ

ত্রৈলোকাং সকলমিদং বিসৃজ্যাত্ময়

স্তেনাথোজ্জনিত মিদং কুলদ্বয়ংনঃ

তশ্চ প্রবৃতি নিবৃত্তৌষেধর্ম্মপত্তৌ তয়োঃ

প্রবৃত্ত্যামুৎপন্নং মহামোহপ্রধানমেকং কুলং

নিবৃত্ত্যা মুৎপন্নং দ্বিতীয়ং বিবেকপ্রধানমিতি

কাম । প্রিয়ে ! আমাদের উৎপত্তিস্থান এক, এ আবার তুমি কি বলছ ।
আমাদের পিতাও এক ।

† আর্ধ্যপুত্র ! শ্রুৎংময়া সুস্বকং শমদম প্রভৃতীনাঞ্চ একমুৎপত্তিস্থানমিতি
ইতি সং ।

ঈশ্বর ঔৎসে ছায় মায়াব গর্ভেতে ।
মন নামে পুত্র জন্মে সৃষ্টির আদিতে ॥
মাতা পুত্র সৃষ্টি অগ্রে এ বিশ্ব সংসার ।
সৃষ্টিলেন কুলদ্বয় মোদের অংগার ॥

সেই মনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুটী ধর্মপত্নী, তার মধ্যে প্রবৃত্তির গর্ভে মহামোহ প্রধান এক কুলউৎপন্ন হয় ও নিবৃত্তির গর্ভে বিবেকপ্রধান এক কুল উৎপন্ন হয় ।

রতিঃ । অজ্ঞউত্ত ! এই এবং তাকিংস্তিসোঅরাণং তুষ্কাণং এ আরিসং
১৩২ । •

রতি । আর্ধ্যপুত্র ! যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তোমাদের ভায়ে ভায়ে
এরূপ বৈরিতা কেন ?

বানঃ । প্রিয়ে ! একামিষশ্চভবমেব সতোদরাণা
মুচ্ছন্ততেজগতি নৈরমিতি স্মিকং
পৃণীনিমিত্তমভবৎ কুরুপাণ্ডনাণাং
তীত্রস্তথাহিভূবনক্ষয়কৃদ্বিরোধঃ

সর্কামনচৈতজ্জগদস্মাকং পিতৃপার্জিতং ওচ্চাস্মাভিস্তাত্তলভয়া সর্ক-
মেবাক্রান্তঃ ।

তেষাম্ভবিরলপ্রচারঃ তেনতে পাপাঃ
পিতর মাস্মাংশেচ ন্মূলদিভুমুগতাঃ

কাম । প্রিয়ে ! একামিষলোভী যদি হয় দুই জন,
সত্যের মধ্যে বৈর করে সে সৃজন ॥
হয়েছিল এ কারণে নিশ্চয়নাশন
ঘাপর যুগেতে কুরুপাণ্ডনেতে রণ ॥

দেখ এই সারাজগৎটাই আমাদের পিতার উপার্জিত অর্নরাই পিতার প্রিয়-
পুত্র, তাই প্রায় সগণ রাষ্ট্রাই আমরা দখল কোরে বসেছি, তাদের দখলে
অতি সামান্ত স্থানই আছে । তাই সেই পাপাত্মারা পিতাকে ও আমাদেরকে
উন্মূলিত করবার উদ্যোগ করছে ।

রতিঃ । (কর্ণোপিধার) গম্বুং পাবং ওজ্জউত্ত । কিং এদং পাবং
বিদেগমস্তকেগল্লেব তেতিং আবভুং অধবাতোহু এষ কোউনাত্তমসি দবেবা ? †

• আর্ধ্যপুত্র ! যদেবং তৎকথং সোদরাণাং যুস্মাকং সৈদৃশং বৈরং (ঠাত সং)

† শাস্তং পাপং আর্ধ্যপুত্র ! কিমেতৎপাপং বিঃসমমাত্রেতৈনবটৈরাবক্কং
ভবতুঅথবা অত্র ক উপায়ে মহয়িতব্যঃ । (ইতি সং)

রতি। (কর্ণে তদুলি দিয়া) অশ্রাব্য। অশ্রাব্য। আৰ্য্যপুত্র। কেবল-
মাত্র বিশেষের বশবর্তী হ'য়েই কি উহারা এই মহাপাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'য়েছে ?
অগণা য'ক্-সে কথ। এখন এ বিষয়ে কি উহায় অবলম্বন, করা যায় ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমৎসিংহচন্দ্র ঙ্গিত্তাভূষণ।

সংবাদ ও যত্নবা।

পদাধিকার। রায় শ্রীযুক্ত হেমশুকুমার বাহাদুর পোর্টাকিসের ডেপুটী-
ডিরেক্টর জেনারেল হইয়াছেন। এ পদে এ পর্য্যন্ত কোনও ভারতবাসীর
অধিকারে আসে নাই, এই প্রথম। "শনৈ পর্কিত লঙ্ঘনং"—নীতির এটিও
একটি প্রয়োগ বটে।

আবৃত্তি পরীক্ষা। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবৃত্তি
পরীক্ষার ফল অনুসারে ছুই দফা পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব কলিকাতা সংস্কৃত
পরীক্ষা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পুরস্কার
দিবেন—কাশীমহাশয়সিধিপতি মাননীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র মন্ডী মহোদয়।
সংস্কৃত পরীক্ষাসমিতির সভাপতি মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। স্মৃতি-
শক্তির উদ্বোধন এই পুরস্কার ব্যৱস্থা যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া অনেকে
মনে করিতেছেন। "কেন পরিচিন্তে।"

কৃতিত্বের কপা। মাত্রাজের কে, পি, শিবশঙ্কর আখার এবার গিভিল-
সার্কিন্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কৃতিত্ব সন্দেহ নাই।

সংকর্ষ। সিমুলিয়ার ত্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মধ্যপ্রদেশে
পার্বত্যপ্রদেশে পেঞ্জাবোড় মালভূমির উত্তরে যক্ষ্মারোগগ্রস্তগণের জন্ত
স্বকাৰ্য্যে একটি স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জাতি ধর্ম নিৰ্বিশেষে
সর্বপ্রাণীর যক্ষ্মারোগীই সেখানে স্থান পাইবে। এতাদৃশ সংকর্ষকারী
প্রকৃতিই প্রণসাই। জগদান্ সংকর্ষকারীকে দোষত্রয়ী করুন।

III.

CO-OPERATION AND NON-CO-OPERATION.

QUESTIONS & ANSWERS.

—

(Continued)

Even if people would everywhere give up District Board and Municipal memberships, Municipalities and District Boards will be managed by District Magistrates as before through paid officers. If jurors refuse to work, the judges will decide cases themselves as before. If Hony. Magistrates resign their offices, more salaried officers will be needed. If Presidents of Panchayet do not do their work, Sub-Inspectors of Police will as before take it up. If Union Boards cease, things will go on as before, but the villages will remain uncared for ; and the work of education and sanitation being left in the hands of central authorities will suffer. So this measure is not likely to paralyse the Govt. Even if it be assumed that the agitation will be able to induce people to give up all honorary offices the Govt. will not be put to any serious difficulty ; For there is absolutely no likelihood that salaried officers will join the movement, and Mahatma Gandhi's programme perhaps does not include it. Even after constant preaching of non-co-operation for about a year it is doubtful whether even half a dozen Govt. officers have given up their offices.

[4] Next as regards the boycott of educational institution :—

Education is now a transferred subject and the people can now, if they think the present system of education to be defective, change it in any way they like. There is no doubt that there should be more vocational schools in the country. But one can open as many institutions of such character without adopting the programme of Non-co-operation. If we want to have more technical schools, let us have them by all means ; but I do not really understand why the existing schools should be destroyed. Only 5 or 6 per cent of the people of India are literate. If the total number of existing educational institutions be represented by 1, there 16 more institutions are needed for the education of our people. If one has an eye to the spread of education, literary and technical, then there is ample room for him to start more primary and secondary high schools without breaking up the existing ones. If the education that is imparted in them proves to be superior to what is given in

the existing institutions, the latter will have to be remodelled after them or they will cease to exist. There was a time when there were no such institutions in this country. Even all of the students desert the existing institutions, the Govt. will go on as before.

But I forget. I understand that the attempt to make the students leave the schools is not really to give them better education, but to turn them into Non-co-operation preachers for the attainment of Swaraj. It has been declared times without number that these boys are to be utilised for preaching Non-co-operation in the villages. It has been also said that India should be considered in a state of war, and so when a country is fighting for its independence, education is not of primary importance. These boys are to enlist themselves as soldiers in the Non-co-operation campaign. The boys of our country and their guardians, though they have shown a little weakness at times, have on the whole stood firm and resisted the seductive charms of Non-Co-operation; and schools and Colleges are getting on as before. No doubt a few boys, some emotional and wellmeaning and other unpromising having little chance of success in their educational career, have left their Schools and Colleges and joined the Non-Co-operation movement and are being utilised as non-co-operation-preachers.

They have proved too strong for their parents, who in this country I regret to say, do not always care to exercise that control over their boys which should be done for their own good. The last Swadeshi movement failed through the excesses committed by such misguided youths. And I am afraid if this agitation is kept up, there will be again a repetition of the scenes which we all now deplore. So the boycott of schools and Colleges is not sufficient to paralyse the Govt. These undisciplined boys are doing lots of mischief and Mahatma Gandhi himself had to condemn their excesses more than once.

Q. Is not Mahatma Gandhi really a noblehearted man? And how is it that he is advocating this policy of breaking up schools and Colleges, if it is harmful to the interests of India?

A. Though my personal acquaintance with Mahatma Gandhi is of a very slight character yet from what I have seen and heard of him. I have no doubt about the nobility of his character. But a good or noble heart is not always a guarantee for sound judgment. He himself perhaps does not claim infallibility for himself though some of his followers claim it for him. It pains me to think that such a salutary character should take into his head the idea of the breaking up of the educational institutions of this country. You

know Pandit Madan Mohan Malaviya and he is as selfless as Mahatma Gandhi. Long before the Non co-operation movement, he had given up a lucrative practice in the Allahabad High Court and had travelled all over country with a begging bowl and devoted himself to the establishment of the Benares Hindu University, which is an unique institution. If our aim is to conserve what is best in our own culture and at the same time assimilate what is best in the west, you cannot devise a better institution than the Benares Hindu University. It is a selfgoverning institution. Even the Chancellor is an Indian. Its only connection with the Govt is that it receives an aid from the Govt. Even when complete Swaraj is attained you cannot conceive of establishing a better institution than the Benares Hindu University. I cannot reconcile the saintliness of Mr. Gandhi's character with his attempt to break up this institution except on the supposition that his vision has been clouded by his overpowering passion for the success of the movement of which he is the apostle.

Q. If he is of opinion that everything that comes through the hands of the Govt, is unclean, is he not consistent in refusing to have any thing to do with an institution which is aided by Govt, and has got its charter from it ?

A. Even in such a case I cannot call him consistent. The Money that is received by the Hindu University is our own money. If the very fact of its passing through the hands of the Govt is objectionable, then how is it possible for him to aim at Swaraj within the British Empire ? For he has clearly said that he is not against responsible Govt, within the Empire. If he can take advantage of railways, post offices telegraphic wires and newspapers which are all registered by Govt, how is it consistent for him to attempt to destroy the educational institutions which he himself would likely be the first to establish if he gets Swaraj, simply because it receives money contributions from the Govt.

(5) Suspension of practice by lawyers. Even if lawyers suspend their practice, courts will go on all the same and judges will decide cases by hearing the parties without their help. Justice may suffer now and then ; but it suffers even now, lawyers notwithstanding. In no court of law in any country are judges infallible and mistakes are committed even by good and honest judges. It may entail a little hard work on the judges but it may also shorten their work, for they will not have to hear long arguments and cross examinations. Nobody is compelled to seek the protection of law courts and the institution of lawyers is an outcome of the British Govt. There

no doubt more lawyers than necessary but as the prospects are becoming less and less bright our educated men are taking to other avenues of life. Lawyers exist because there is litigation. There are lawyers even in the freest of countries. The profession is an independent and honourable one, though Mahatma Gandhi has painted it in the darkest of colours. He was himself a lawyer for a considerable time and he is not ashamed of his achievements as a lawyer. Lawyers in every civilised country are sturdy champions of liberty and have frequently stood between the oppressor and the oppressed. Most of the greatest statesmen of the world are lawyers. There are good and bad men in the legal profession as in every other walk of life. The study of law gives a logical training to the mind which enables one to decide promptly between right and wrong. A sound lawyer never takes to quibbling which is often quoted as derogatory to the profession. Inordinately credulous as the masses of this country are and ready to swallow, as they do, ex parte and hearsay statements, the training of a lawyer is a guarantee against such a frame of mind. Lawyers are intelligent enough to know what is what and up to this time, I believe, not even a dozen pleaders of established practice have adopted Mahatma Gandhi's programme. Just as there are emotional boys so there are some emotional lawyers and just as there are failures among boys so there are failures among lawyers and Non-co-operation may succeed with them. There are also some sincere and able men whose regard for Mahatma Gandhi might have induced them for the time being to adopt the course as an experiment which in cooler moments they will come to consider utterly futile for the attainment of Swaraj. The experience of the last six months has clearly shown that lawyers as a body have a sturdy common sense which refuses to yield to the dictum of any one howsoever high his position and noble his character may be. Some of those Non co-operating lawyers may be utilised as preachers, honorary or salaried, and this preaching may succeed to excite the masses especially at a time when prices have gone high and create in their minds a prejudice against the Govt. This may lead to agrarian riots and anarchy, but it will not achieve the end in view.

(6) Arbitration Courts.

Q. If people settle their disputes by arbitration and do not resort to the lawcourts that will be boycotting the lawcourts and is not the boycott of lawcourts an effective weapon ?

A The British Govt, does not compel any body to come to British Courts. People can always settle their disputes by arbitration. Suppose two persons dispute over a plot of land each claiming it as his own ; and one of them eventually succeeds to get possession of it. The dispossessed party comes to the civil court and the matter is ultimately decided by a decree of the court. The winning party gets the land by virtue of that decree. Here there is the sanction of the law and the winning party is maintained in possession by the State by virtue of the decree. They may also go to arbitration and have the dispute settled by an award of one or more arbitrators. The award may be filed in court under the provisions of the Civil Procedure code and a decree obtained from it on its basis and the result is the same as before. But if there is no decree of the court on the basis of the award there is nothing to prevent the winning party from being dispossessed again. So in every case you are in need of a power to enforce justice. You cannot conceive of any people in any country where there will be total absence of rival claims. They have law courts in free countries also and we must have our lawcourts even when we get Swaraj. It is inconceivable that for a whole year the people will suffer civil wrongs without any redress. Arbitrators have no powers to enforce their awards. Human beings are not angels and they must have differences and these differences must be settled and peace preserved by the ultimate authority of some Govt. or we shall revert to a state of nature. Even at present criminal cases not of a serious nature can be compounded. But the perpetrators of serious offences such as robbery, murder etc, must be punished for the preservation of society. Life, liberty and property will be unsafe if there are no courts. Even if you can imagine that people may be made to abstain from law courts, still the Govt. will not be paralysed. It will only lose the revenue but it will be easily recouped from other sources. If jails are taken into account along with criminal courts, then they are more a spending than an earning Deptt. Litigation especially in some parts of India has no doubt become an evil and every one deplors it, The Government has however never been against the settlement of disputes by arbitration.

In the year 1893 I wrote an article in my journal The Hindu Patrika and since then I have been always doing my humble best to have disputes settled by arbitration within the small sphere of my humble influence.

The following rules were framed for the formation of Arbitration Courts.

Litigation and Arbitration Courts.

Litigation—a disease.

"Litigation has assumed the form of a disease in this country. We do not clearly comprehend that this selfimposed disease is working out our ruin. For the number of suits would be going up every year. Litigation has become a habit with us. A drunkard knows the evil effects of drinking, but yet he cannot give up the habit, so is also the litigant in many instances."

Loss of money.

Of the evils of litigation, the first is the loss of money. The end of litigation is not always gained even if one wins. You file a suit for the possession of one bigha of land. The money that is spent in the first court of law, leaving the expenditure in the two higher courts of appeal out of account, is enough to buy more bighas of land than one. The other gains are loss of time, injury mental and physical, worry, various indignities in court, increase of hostility with the other party and laying the foundations of fresh litigation in future. Even in big suits the gain is more than counterbalanced by the fees paid to lawyers. Many prosperous families of our country have been utterly reduced to poverty by litigation.

Litigation when prompted by motives of revenge rather than of gain is like as the Bengali adage goes, cutting ones own nose to make the enemy's journey inauspicious,

The ways of the wicked.

Most of my readers are perhaps aware of the story of a wicked Brahmin. A poor but wicked Brahmin prayed for a boon from Mahadeva that he might get whatever he prayed for. But Mahadeva granted the boon but limited it to three occasions and further said that his neighbours would get twice as much every time. The first and second time the brahmin asked for various useful articles and got them; but his neighbours each time got double of what he got. That was too much for the wicked man. And he prayed, 'Let one of my eyes be blinded.' He lost one eye, his neighbours however lost both their eyes. He was right glad; and he robbed his neighbours of all their wealth and possessions.

After a few days a gang of robbers fell upon the Brahmin's house. He ran to his neighbours' houses for aid, but being blind, they could do nothing to help him. It was then that the Brahmins saw his folly and realised the truth that in doing harm to others one harms himself. Litigation however is often necessary. When the

strong oppress the weak, what can the latter do but to seek the protection of law? The right party however does not always win, some times it all depends upon chance and if all civil suits are settled by arbitration, according to our old custom, there will be less perjury & less waste of money and the possibility of fresh litigation will be minimised. Arbitrators should be honest & intelligent and of the locality who know the parties and witnesses well.

Arbitration courts.

It should be clearly explained to villagers how litigation is doing great harm to them. It should be pointed out that all classes of people the tenants the landlords, the debtors and the creditors are alike suffering by litigation and that it would be a relief to all of them if disputes are settled by arbitration. Again if it is once pointed out to the people that it is an illusion to expect a fair settlement by the justice administered in the lawcourts through various intricate laws and false depositions on both sides, then they will no more have any appetite for litigation and shun it like the proverbial "laddu of Delhi." People will fly to arbitration courts whenever they are wronged, if they once come to know that such courts exist and that they may hope for better justice in them than in the law courts. Wicked litigants may seek justice in the law courts thinking that their ends would not be accomplished by the judgment of the arbitration courts; but if men's minds might be inspired with a burning sense of hatred for false litigation and false evidence then even these people would resort to arbitration courts for fear of social humiliation. But it is said that such arbitration will meet with

Opposition from lawyers.

as it will entail loss to them. Those who have such misgivings in their minds should know that lawyers exist because there is litigation and not that litigation exists on account of lawyers. If litigation goes on decreasing, educated men will gradually take to other walks of life and not turn to law. It is very uncharitable to think that lawyers desire to see their country ruined through litigation though it may be to their own advantage. Physicians are necessary when there is a disease. But they cannot be said to be its cause. So I cannot believe that lawyers will put any obstacle in the way of disputes being settled by arbitration. There are others who think that.

Government will oppose it.

Those who entertain such uncharitable feelings against the Govt should disabuse their minds of it. No Govt. can have any desire to ruin the people for the sake of increasing its revenue from court-fees. There have been not wanting instances where high officials had made proposals from time to time for reducing litigation. Taxes on litigation are levied for defraying costs of the administration of justice. And the balance after deducting the expenses from the receipts goes towards the defraying of expenses of other departments. The lesser the litigation, the lesser the revenue but it can be recouped in other ways.

The Constitution of Arbitration Courts.

It may be thought that it would be impossible to settle by arbitration the disputes of a single district not to speak of the whole of India. A little reflection will show that it is quite feasible. At present the administration of justice has been centralised in district and subdivisional headquarters. But if arbitration courts are established for groups of villages, the work of the arbitration courts will be very light. No initial expenditure is necessary for the establishment of arbitration courts; all that is necessary is a little organisation. If a few educated and patriotic men in every district make it a point to establish arbitration courts they can do it very easily. It will not do simply to weep over the sorrows of the country. We must make determined efforts for removing them. Keep the examples of the ancient sages of this country steadily before your eyes; remember how they used to teach people and treat patients without fees in ancient days, and how they used to administer justice in the law-courts without salaries. Patriotism is not dead in this country; only a little organisation is needed. Remember the wellknown lines of the Gita.

"You have a right to do your duty but not to the fruits thereof."

(Continued.)

